অঞ্জলি
১৪২৫
Anjali 2018: Durga Puja Magazine
Greater Binghamton Bengali Association

সূচীপত্র

দীপা দাশগুপ্তা ~প্রচ্ছদ এবং ভিতরের অঙ্কন, ভাস্বতী বিশ্বাস`~আলপনা, সৌরভ ঘোষ~সরা পেইন্টিং~শেষের দুই পাতা

Message from the Board   Utpal Roychowdhury 3

সম্পাদকীয়   প্রদীপ্তা চ্যাটার্জি 4

প্রবন্ধ

উদয় নারায়ণ সিংহ ~কবির সৃজন-বিশ্ব 5-9, অমীয়া ব্যানার্জী ~ঈশ্বরের প্রতি বাঙালীর ভালবাসার প্রতীক দেবীদুর্গা মাতা 10-11,

অর্ণব দাশগুপ্ত ~স্বামী বিবেকানন্দের কিছু কথা 12-13, বিরূপাক্ষ পাল রবীন্দ্রনাথ ও একাকীত্বের আরাধনা 14-15,

যযাতি কহেন ~বাঙ্-ময়ী 16-17

গল্প

উৎপল রায়চৌধুরী ~অচিন দেশের রূপকথা 18-19, ভাস্বতী বিশ্বাস ~গ্রীষ্মের সেই রাত্রি 20-22, বন্দনা মিত্র ~আজ দশমী 23-24,

সায়ক সেনগুপ্ত ~স্মৃতিটুকু থাক 25-26, অনন্যা দাশ ~ভুল 27-28, দীপঙ্কর চৌধুরী ~রোদ্দুর! রোদ্দুর!! 29-31, তুষ্টি ভট্টাচার্য ~রুটিন 32,

সপ্তর্ষিমন্ডল 33, দেবতোষ ভট্টাচার্য ~প্যাঁটরা 34-36, বন্দনা মিত্র ~মরা তো আর যায় না ! 37-38, পুতুল খান ~অসমাপ্ত ভালবাসা 39-

40, গৌতম সরকার ~ভায়রা-ভাই 41-43, দেবাশিস দাস ~সিঁদুর খেলা 44-45

কবিতা

পুতুল খান~আমার ভালোবাসা 40, অঞ্জলি দাশ~ একান্নপিঠ 46, ডানা 47, অশ্রুসংক্রান্ত 48, সম্পর্কের সূত্র 48

সুদীপ্ত বিশ্বাস~ বাঁচার মজা 49, পুনরুত্থান 49, পাতকী 50, বাক্যহারা 50

প্রণব বসুরায়~ নতুন ভাষায় 52, ক্ষমা চাই 52, কোলাজ 53, নুপুর রায়চৌধুরী 54-55, মলয় সরকার~ সম্বল 56, এবার চলেছি আমি 56,

ভাঙা বাড়ি 57, অপেক্ষা 57, আয়নায় 58, আর্যা ভট্টাচার্য~ আভাস 72, অপেক্ষা 72, স্মৃতির গন্ধ 73

শিল্প

স্বপ্নিলা দাশ 59, সৌরভ ঘোষ 60-61, প্রিয়ঙ্কা বিশ্বাস 62, দীপা দাশগুপ্তা 63, 65, অমৃতা ব্যানার্জি 64, 67,

প্রদীপ্তা চ্যাটার্জি 64, ভাস্বতী বিশ্বাস 66, সীমা রায়চৌধুরী 68

স্মৃতিকথা

দেবায়ন চৌধুরী~ পুজোর গন্ধ 69-71, লিলি বন্দোপাধ্যায়~"মধুর তোমার শেষ যে নাহি পাই" 74-77

রম্য রচনা

সুশোভিতা মুখার্জি~ বিয়েবাড়ি 78-81

ভ্রমন

প্রদীপ্তা চ্যাটার্জি~ রোম শহরের একটুখানি 82-85

Children's' Corner

Anya Chatterji 86-87, Aditya Banerjee 88, Ananta Banerjee 89, Rhea Singh 90, Lisa Singh 90, Ella Bagchi 91, Sureeta Das 91-93, Arpan Dasgupta 94, Swarnima Das 95, Roshni Ray 96, Sriram Chakravadhanula 97-99

English Section

Amal shastri~ Realization of God 100-101

Archana Susarla~ Mysore Palace 102-103

Sushma Vijayakrishna~ I survived...! 104-106

Archana Susarla~~ Sita Ramachandra Swamy Temple 107-108

Nita Mitra~ A Fractured Globalized Family 109

Bulu Dey~ Dreams 110-111

Aditi Ganguly~ The golden opportunity 112

Archana Susarla~ Tirupati 113-114

Sankar Chanda ~ Assimilating into Multicultural America 115-119

Asish Mukherjee~ The Resurrection 120-124

Greater Binghamton Bengali Association: ~2018~ Committees 125

Durga Puja Programs 126

Page 127 is intentionally left blank.

Sarod Recital Information 128

Message from the Board

Dear Friends,

The Greater Binghamton Bengali Association (GBBA) will proudly celebrate the Durga Puja for the eleventh year on October 20, 2018.

Our second decade of the event celebration brings forth new promises of continuity and sustainability. We sincerely acknowledge the tremendous contributions of many dedicated volunteers for this success. The continuing enthusiastic support from our patrons is inspiring. We express our profound gratitude toward them.

The evening program will present local talents, including performances by children. Bengali songs and Bollywood music will be an integral part of the scintillating after-dinner music program by our invited artist. Please join us to share the festivities of the occasion.

We tremendously value your continuing participation for the celebration of Durga Puja and for all other community activities. GBBA strives to foster friendship and fellow feeling among our community members. Your involvement is a key factor toward reaching that objective. We are grateful for your commitment, enthusiasm and support. Thank you.

Sincerely,

2018 Durga Puja Committee
Greater Binghamton Bengali Association
https://gbbapuja.webs.com

সম্পাদকীয়

দুর্গাপূজা বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মীয়, সামাজিক, ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সারা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা সকল বাঙালি এই শারদোৎসব নিষ্ঠা এবং ভালবাসার সঙ্গে পালন করেন। আমরাও এই যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলের একটি ক্ষুদ্র শহর ও তার চারি পাশের কিছু বাসিন্দা মিলে পরম আগ্রহের সঙ্গে মায়ের পূজার আয়োজনে মেতেছি। শারদ সাহিত্য চিরদিনই দুর্গাপূজার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য হয়ে থেকেছে। এই ঐতিহ্য বজায় রেখে আমরাও প্রতি পূজাতে আমাদের পূজা পত্রিকা অঞ্জলি প্রকাশ করি ; প্রতিবারের মতো এবারেও আমাদের সাহিত্য নিবেদন অঞ্জলি আপনাদের কাছে নিয়ে এলাম আপনাদের ভাল লাগার আশায়

আজ থেকে এগার বছর আগে আমাদের শহরের সামান্য কয়েক জন মানুষের উৎসাহ ও প্রচেষ্টার ফলে এই গ্রেটার বিংহাম্পটনের দুর্গাপূজার সুরু হয়। সেই সঙ্গে প্রকাশিত হয় আমাদের প্রথম শারদীয়া সাহিত্য সম্ভার অঞ্জলি। যদিও খুবই সামান্য বাজেটে আমাদের প্রথম বছরগুলির পূজা সম্পন্ন হয়েছে তবুও আমাদের শারদ সাহিত্য প্রকাশের অন্যথা করা হয়নি। কারণ বাঙালির কাছে দুর্গোৎসব শারদ সাহিত্য ছাড়া অসম্পূর্ণ থাকে। প্রথম বছরগুলিতে অঞ্জলিকে রঙিন করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি, তবে সেই সময়ে বিরূপাক্ষ পাল তাঁর সৃজনীশক্তি ও পরিশ্রমের সঙ্গে অঞ্জলিকে সৌন্দর্যময় করে তুলতেন।

আজ গত কয়েক বছর ধরে সৌভাগ্যবশত: আমাদের মায়ের বন্দনা অনেক বেশি সমারোহ ও আড়ম্বরের সঙ্গে উদযাপন করা সম্ভব হচ্ছে এখনও এর অন্তরালে থাকে সামান্য কয়েকজন মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রম আর নিষ্ঠা।

কোলকাতা থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে বসেই তাই এখন পূজোর আগমনীর উত্তেজনা অনুভব করতে পারি। এখানকার বাতাসে যদিও এখনই লেগেছে হিমেল ছোঁওয়া , আকাশও প্রায়ই থাকে মেঘলা, আর শরতের গাঢ় নীল আকাশের সাদা মেঘের খেলা দেখবার সুযোগ কমই হয়। তবুও যা পাওয় যায় তাও কিছু কম নয়। ভক্তি,নিষ্ঠা ও ভালবাসার সমন্বয়ে উদযাপিত দেবিবন্দনা করবার সৌভাগ্য কিছুক্ষণের জন্য পরবাসে জীবন কাটানোর বেদনা ভুলিয়ে দেয়।একটি পুরো দিন ভরে এত গুলি উৎসব ও অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করবর সুযোগ ;ভোরবেলা থেকে পূজোর আয়োজন, পূজার মন্ত্র শোনা ,ঠাকুর দেখা, অঞ্জলি দেওয়া , ঢাকের বাজনা , চেনা পরিচিতদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ, আলাপ পরিচয়, মন প্রাণ আনন্দ ও উত্তেজনায় ভরিয়ে দেয়।

পরবাস ওয়েব-জিনের সমীর ভট্টাচার্যের আন্তরিক সাহায্যের জন্য এবারের অঞ্জলিতে আমরা বেশ কিছু লেখক লেখিকাকে পেয়েছি যাঁরা অঞ্জলিতে আগে লেখেননি। এই যোগাযোগের ফলে আমরা আশা করছি অঞ্জলি আরও কিছু মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে যাবে। অঞ্জলির পক্ষ থেকে সমীর ভট্টাচার্য কে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আজ এই আনন্দের দিনে একটি দুঃখের সংবাদও উল্লেখ করবার প্রয়োজন, বহু বছর ধরে বস্টন প্রবাসী লেখক ডক্টর প্রভাত হাজরা গত জুন মাসের শেষে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। গত দশ বছর ধরে ডক্টর হাজরা অঞ্জলির জন্য লিখেছেন এবং অনেক সময় অসুস্থ অবস্থাতেও। পরিণত বয়সে কলম ধরে ডক্টর হাজরা সাহিত্যের মাধ্যমে এদেশের অনেক বাঙালি পাঠক পাঠিকা কে আনন্দ দিয়েছেন। ডক্টর হাজরার ফেলে যাওয়া গল্প ও কবিতার মধ্য দিয়ে আমরা তাঁর কথা মনে রাখব

আপনারা যাঁরা সাহিত্য ও শৈল্পিক অবদানের দ্বারা অঞ্জলি ১৪২৫ কে সম্ভব করেছেন তাঁদের জন্য অঞ্জলির পক্ষ থেকে অভিনন্দন রইল।

আপনাদের সবাইকার জন্য রইল অনেক প্রীতি, শুভেচ্ছা, ও শুভকামনা।

প্রদীপ্তা চ্যাটার্জি

কবির সৃজন-বিশ্ব

উদয় নারায়ণ সিংহ

শৈশবসংগীতে কবি এক বালকের কথা লিখেছিলেন যাকে মুমূর্ষু পিতার কাছে দেখা গেল গভীর রাতে যখন সারা পৃথিবী নীরব নিশ্চুপ - যে দেখছে বীর বাবার হৃদয়ে ছুরিকা বিঁধানো – বিবর্ণ মুখে রোষের অনল, যিনি সন্তানকে একটা পাল্টা রক্তপাতের প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞায় বাঁধছেন। প্রতিহিংসার ভাবনা নিয়ে বালক ক্ষত্রকুলপ্রভুর কাছে শপথ নিয়ে বেরিয়ে আসে পিতার হত্যাকারীকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে, কিন্তু হায় - যে মালতীবালার প্রেমে প'ড়ে ভালোবাসার নরম অনুভূতিগুলি তার বুক থেকে প্রতিশোধের জ্বালা দেয় মুছে, দেখা যায় তারই পিতা হলেন সেই অজানিত শত্রু যাকে বীরবালক খুঁজে বেড়িয়েছে সারা পৃথিবীতে। তার পরের হাহাকারের গল্প সবাই আঁচ করতে পারবে। অথচ সেই অশোক বালক তখন ভূমির 'পরে বসে "আপন ভাবনা-ভরে" দুঃখ ও বিষাদের কথা ভুলে যাবে, সেটাই শিশুর ধর্ম। সেই শৈশবকে আমরা বোধ হয় বিসর্জন দিতে চলেছি অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সঙ্গে, যার ফলে আজ সন্ত্রাসের পথে শিশু-কিশোরেরাও হাতে অস্ত্র তুলে নিচ্ছে। এটাই সম্ভবত আজকের সভ্যতার সবচেয়ে বড় সংকট অথচ এই 'ভাবনা' বা 'দুর্ভাবনা' নিয়ে আমরা কেউ বিচলিত নই।

মনে হয় এ-যেন কোনো মনগড়া পুরাণ-কাহিনী পড়ছি যেখানে ভস্মাসুর শিবের আশীর্বাদ পেয়ে প্রথমেই পৃথিবীর বুক থেকে মুছে দিতে চাইছে 'বসন্ত'-কে, কেননা এ সেই সময় যখন পৃথিবী সেজে ওঠে অপরূপ সাজে; বিসর্জন দিতে চাইছে বর্ষা-কে কারণ এ-এক এমন ঋতু যখন প্রচুর নতুন প্রাণ নবীন সম্ভাবনার বীজ-বপন করা হয় - কারণ যা কিছু শিব ও সুন্দর, ও তারই বিরোধী। অসুরের মনে হয়েছে ঋতুর এই বিবিধতা - এ-সবই ঈশ্বরের ষড়যন্ত্র, জগত জুড়ে যদি একটি ঋতুই থাকে তো ক্ষতি কি? এত শত প্রাণীরই বা কোন উপযোগিতা? কেউ হাঁটে, কেউ সাঁতরায়, কেউ ওড়ে, কেউ বুকে হাঁটে - কি দরকার এত রকমের? এক সুর, এক গান, এক তান, এক কথা, একই পরিধান - না-জানি কত সুন্দর হবে সেই পৃথিবী? অত আলো, এমন রঙের বিবিধতাই বা কেন? সবাই যদি হয় লাল, নয় সবুজ অথবা গেরুয়া পতাকার তলায় এসে দাঁড়ায়, তাতে কি ক্ষতি? যে কেউ এই একরূপতার বিরোধী, তাকে নির্মমভাবে দমন করতে হবে। প্রতিটি সংঘর্ষে, প্রতি রণে, প্রত্যেক বিশ্বযুদ্ধে এইটেই করতে চেয়েছে ভস্মাসুর, অথচ সে গল্প কেউ বলে না। এমন গল্পের পৃথিবীতে হানাহানি হবে একটা বিশাল প্রদর্শ-ক্রীড়া যা দেখবে সবাই আর যা নিয়ে মেতে উঠবে, অসিযুদ্ধ থেকে ষাঁড়ের লড়াই অথবা আজকের চর্ম-গোলকের খেলা তার কাছে ফিকে হয়ে যাবে।

ভাবছি - কি-করে আটকানো যায় এই অসুরদের যারা আমাদের বিচিত্রতার বৈভব ও বহু-বর্ণতার বিরোধী; তাদের হাত থেকে স্বপ্নবাচী শৈশবকে আর অতিচঞ্চল কৈশোরকে কিভাবে রক্ষা করা যায়? যে ঝুলিতে ঠাকুরমারা কোনো এক যুগে গল্প-গাছা নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন অথবা কথক ঠাকুরেরা বেছে-ছেনে বহু-বিচিত্র কাহিনী গেঁথে-গড়ে শোনাতে পারতেন, সেই ঝুলি এখন মলিন ও পরিত্যক্ত; আজকের বয়স্করা গল্প গড়া ও গল্প বলার শিল্প ভুলে গেছেন, শুধু চোখ রাখছেন পর্দায় কোথায় নতুন আঘাত, নতুন হানাহানি কিংবা শরীরী অত্যাচারের সত্য-ঘটনা ঘটছে; কথক ঠাকুরেরাও বোধ করি দূর-সঞ্চারের কাছে নতুন জিলিপির প্যাঁচ হাজার এপিসোডে লিখবেন বলে দাসখত সই করে দিয়েছেন। আর কমলাকান্ত থেকে রবিঠাকুর হয়ে সুনীল-শীর্ষেন্দুতে এসে ছোটদের মত করে ছোটদের জন্য গল্প বলা যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। ভূতেরা যে-যার ডালে ফিরে গিয়ে চলন্তভাষে লম্বা লম্বা বিশ্রম্ভালাপে ব্যস্ত, ডিটেকটিভেরা অন্যত্র রহস্য উন্মোচনে ব্যস্ত, আর অভিযাত্রীরা প্রতীক্ষা করছেন কবে আবার এল-টি-সি পাওয়া যাবে। এ এক অসহনীয় অবস্থা - যার থেকে হাত ছাড়াতে গিয়ে কিছুদিন আগে লিখেছিলাম কারিগরেরই জন্য চোদ্দটা ভুতের গল্প নিয়ে নতুন বই - ভূতচতুর্দশী। এত সাড়া পাওয়া যাবে বুঝিনি, তাই এখন ভাবছি এবার আরো লেখার পালা - এর আগে শুধু মাত্র ছড়ার বই 'খাম-খেয়ালি' লিখেই ক্ষান্ত হয়েছিলাম; অথচ এবার মনে হচ্ছে আবার গল্পদাদুর আসর জমানোর পালা। কিন্তু তারও আগে মানে হয়েছে খোলসা করা দরকার - কিভাবে পড়া যায় সংস্কৃতিকে? অতএব এই পাঠের অবতারণা।

আরেকটা অভাব আমাকে খুবই ভাবিয়েছে - যা-কিছু করছি তার মধ্যে নিষ্ঠা ও ভালোবাসার অভাব। প্রবন্ধ লিখছি, গবেষণা করছি অথচ নতুন কোনো কথা বলার মত উত্তেজনার অনুভূতি আমার ভেতরে নেই, নারী-পুরুষের সম্বন্ধের জটিলতা নিয়ে গল্প

ফেঁদেছি কিন্তু তাতে যৌনতার স্বরই মুখ্য - এমন লেখা, আলোচনা ও অনুষ্ঠান আমরা হার-হামেশাই দেখছি। মনে এই গবেষণার সাতবাসি রূপ ও কথানকের আবিলতা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য মন ছটফট করতে থাকে। শেষ বয়সে এসে কবি যে কথা সোচ্চারে বলে গেছেন তা বারবার অনুরণিত হতে থাকে - যেখানে রয়েছে শুধু 'ভালবাসা'র প্রতিশ্রুতি: 'আজ দিনান্তের অন্ধকারে/ এ জন্মের যত ভাবনা যত বেদনা/ নিবিড় চেতনায় সম্মিলিত হয়ে/ সন্ধ্যাবেলার একলা তারার মতো/ জীবনের শেষবাণীতে হোক উদ্ভাসিত— / " ভালোবাসি" ।

ইদানীং কয়েক বছর আগে ২০১৩-সালে নতুন করে ভালোবাসার পাঠ নিলাম আমার সেই সময়কার সদ্য শেষ করা অনুবাদ ও বিস্তারিত ব্যাখ্যায় সমৃদ্ধ 'অন্য গীতাঞ্জলী' (‘The Other Gitanjali’) নামের ইংরেজি গ্রন্থটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দক্ষিণ-পশ্চিম পিরানে পর্বতের উঁচু পাহাড়ে ঘেরা একটি ছোটো দেশ 'এ্যান্ডোরা'-য়, যার ঠিক আগেই বেলজিয়ামে আমরা ল্যুভেন শহরে ভালোবাসা নিয়ে একটা পাবলিক ডিবেট-এ যোগ দেবো যেখানে আলোচ্য বিষয় হল ভালোবাসা - মির্চা এলিয়াদ ও মৈত্রেয়ী দেবীর অন্তর্সম্বন্ধের পরিণাম-স্বরূপ রুমানিয়ান ও বাংলায় যে-দুটি অসাধারণ উপন্যাস লেখা হয়েছে, যার পশ্চাদপটে রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, এই বিষয়ে মুখোমুখি আলোচনায় যাতে অন্য আলোচক ও-দেশের বিখ্যাত অধ্যাপক সোরিন অলেক্সান্দ্রিস্কিউ। ইউরোপালিয়া উত্সবের সেবারের ভারত-কেন্দ্রিক অনুষ্ঠানের প্রধান বিষয় হল ‘ভালোবাসা’ যাকে প্রাচ্যে ও পশ্চিমে কিভাবে দেখা হয়। এ-নিয়েও পরে অবশ্যই একটা বড় লেখার পরিকল্পনা রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের সৃজন-বিশ্বের নির্মাণের ইতিহাসে যাঁরা অপরিহার্য ছিলেন, কালের বিস্মৃতির অভ্যাসে তাঁদের অনেকের নামই আজ অনুচ্চারিত। পঞ্জিকার চিত্রগুপ্ত যে বিলুপ্তির খেরোর খাতায় এঁদের অনেকের নাম তুলে ফেলেছেন, তাতে সন্দেহ নেই। সেখান থেকে তাঁদের বেছে এনে কবি-জীবনীর পাতায় স্থান ক'রে দেওয়ার জন্য আমাদের নিঃসন্দেহে নতুন ক'রে প্রশান্ত পালেদের খুঁজে বের করতে হবে। আবার অনেকেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তার জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে দায়ী ছিলেন - যাঁরা হয়ত খ্যাতি, প্রতিপত্তি, পদ-মর্যাদা বা পুরস্কারের তোয়াক্কা না করেই এবং সরাসরি কবির বা তাঁর সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানের (শান্তিনিকেতন) সংস্পর্শে না এসেও শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথের চিন্তা, আদর্শ, কৃতিত্ব এবং পথ-নির্দেশের উপর অগাধ আস্থা রেখে এগিয়ে এসেছেন ওঁর লেখা, সুর, আঁকা, বলা, গড়া আর করার প্রচারের অভিনব সব উদাহরণ গড়ে তুলতে।

কেউ হয়ত সুরের জাদুকর, যাঁকে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মূর্ছনা ও তার সমৃদ্ধ শব্দ-সামর্থ্য কোথাও স্পর্শ করে গেছে - আর তিনি নিজেকে যুক্ত করেছেন বিভাষায় সেই সব গানকে ও কথাকে রূপ-দান করতে। অথবা সেই সুরকে ভিত্তি করে নতুন নতুন সিম্ফনি গড়ে তুলতে বা নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে। অনেকে সেই সব গল্প-কথা বেছে নিয়ে তাদের - কবির ভাষায় বলতে গেলে 'সিনেমা-নাট্যে'র নিজস্ব ভাষায় অনুসৃজন করেছেন। নিজেরা বিশ্ব-বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের আলোয় প্রতিফলিত হয়ে কিছুটা খ্যাতি পাবেন, সেই কথা মাথায় না রেখেও অনেকে রবীন্দ্র-অনুবাদে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে যোগ দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই হয়ত অন্য ভাষায় রচনাশীল ও প্রতিষ্ঠিত কবি - যাঁদের কোনও প্রয়োজন ছিল না কবিকে সে সব ভাষার পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার। হিন্দি সাহিত্য জগতে রামধারী সিংহ 'দিনকর', তেলুগুর 'চলম'-এর মত কবি বা ফরাসির আন্দ্রে জীইদ এঁরা এই দলে পড়েন। জ্ঞানপীঠ পুরস্কার-বিজয়ী দত্তাত্রেয় রামচন্দ্র বেন্দ্রে (১৮৯৬-১৯৮১) - যাঁকে কন্নড় ভাষার একালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও অধিনিক কন্নড় কবিতার জনক মনে করা হয়, বাংলা শিখেছিলেন শুধু কবিগুরুকে মূল পাঠে পড়তে-জানতে। এ কি কম আশ্চর্যের কথা? তাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতামালা - 'সাধনা' ছিল এক আবিষ্কারের মতই। তবে রবীন্দ্রনাথের রচনা-সম্ভারের গুণগত উত্কর্ষের তুলনায় সমতুল খ্যাতি কি হয়েছে - বা আজকের বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার পাঠক কি ওঁর কৃতি পড়তে পাচ্ছে - এ প্রশ্ন উঠতেই পারে। কবি নিজে অবশ্য অবহিত ছিলেন যে এই খ্যাতির উপরে রয়েছে প্রলেপ মাত্র - আধুনিক মত্ততার ইঙ্গিদুই পলিমাটি; তাই লিখছেন 'পুনশ্চ'-তে :

এখন আমার কথা শোনো।

আমার এ খ্যাতি

আধুনিক মত্ততার ইঞ্চিদুই পলিমাটি -' পরে

হঠাৎ - গজিয়ে - ওঠা।

স্টুপিড জানে না —

মূল এর বেশি দূর নয়;

ফল এর কোনোখানে নেই,

কেবলই পাতার ঘটা।

তবে কবি হয়ত জানতেন - আজকের প্রজন্মের কবি-সমালোচক, যাঁরা সহজেই মূল-পাঠ বা তার সময়-স্থান সীমার কথা না জেনেই সহজেই ঘোষণা করতে পারেন - গিরিশ কার্নাডের মত - যে রবীন্দ্র-নাটক আদৌ মঞ্চন-যোগ্য নাট্য-কৃতি নয় - তাঁদেরকে বলতেই হবে: "আমি জানি তুমি কতখানি বড়ো।/ এ ফাঁকা খ্যাতির চোরা মেকি পয়সায়/ বিকাব কি বন্ধুত্ব তোমার।"

খ্যাতি ও তার অর্জনের লোভের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের তির্যক মন্তব্যের কথা এঁরা জানতেন। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে কবি 'ভারতী'-র আশ্বিন ১২৮৮ সংখ্যায় লিখেছিলেন (যা পরে বিবিধ প্রসঙ্গ, পৃ ২৯২-এর অন্তর্ভুক্ত হয়): "কবিরা··· অসাধারণ বুদ্ধিমান। তাঁহারা বুঝেন, কিন্তু এত বিদ্যুৎ-বেগে যুক্তির রাস্তা অতিক্রম করিয়া আসেন যে, রাস্তা মনে থাকে না, কেবল বুঝেন মাত্র। কাজেই অনেক সমালোচককে রাস্তা বাহির করিবার জন্য জাহাজ পাঠাইতে হয়। ··· দ্রুতগামী কবি সহসা এমন একটা দূর ভবিষ্যতের রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হন যে, বর্ত্তমান কাল তাঁহার ভাবভঙ্গী বুঝিতে পারে না। ··· কাজেই সে হঠাৎ মনে করে কবিটা বুঝি পথ হারাইয়া কোন অজায়গায় গিয়া উপস্থিত হইল ; কবিরা মহা দার্শনিক। কেবল দার্শনিকদের ন্যায় তাঁহারা ইচ্ছা করিলে নির্বোধ হইতে পারেন না। কিয়ৎ-পরিমানে নির্বোধ না হইলে এ সংসারে বুদ্ধিমান বলিয়া খ্যাতি হয় না।" অগ্রজ কবির কথা-মত 'কিয়ৎ-পরিমানে নির্বোধ' হতে এঁদের আপত্তি ছিল না - শব্দে খাপ খাবে না পুরোপুরি, কোথাও ছন্দেরও হয়ত কিছুটা গরমিল থেকে যাবে, কোথাও বাংলার সঙ্গে সংস্কৃতিগত প্রভেদে অনুকৃতিতে আসবে নানান সমস্যা - তবু হার মানার কিছু নেই।

ক'বছর আগে গিরীশের কথায় রবীন্দ্র-নাটকের কথা উঠেছে বলে বলতে চাই - নাটকের নানান প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথের ৬৪টি নাটক না-হলেও বেশ কটিকে কলাপ্রেমী দর্শকদের সামনে নতুন আঙ্গিকে মেলে ধরেছেন। কিছু কাল আগে সতীশ আলেকরের মত বিখ্যাত মারাঠী নাট্য-ব্যক্তিত্ব যখন ২০০৮-এ 'ফাল্গুনী' বা 'The Cycle of Spring'-এর মারাঠী নাট্য-রূপ 'চৈত্রা' মঞ্চস্থ করেন, অথবা ২০০৬-এ মুম্বাই-এর বিখ্যাত নেহেরু থিয়েটার ফেস্টিভালে যখন হাবিব তানভির রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস 'রাজর্ষি' ও নাটক 'বিসর্জন'-কে নিয়ে নতুন প্রযোজনা নিয়ে এলেন 'রাজ-রক্ত' নামে। রাজা, ডাকঘর, রক্তকরবী আর মুক্তধারার হিন্দি অনুবাদ সাহিত্য আকাদেমি কর্তৃপক্ষ ১৯৬৬ সালেই ছেপে বের করেছিলেন - যার ফলে এই নাটকগুলির মঞ্চ-রূপ সহজ হয়েছিল। এ ছাড়াও, কলাক্ষেত্রের সত্তর-উর্ধ্ব বরিষ্ঠ অধ্যাপক ও রুক্মিণী দেবীর ছাত্র এ জনার্দন যখন 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যের ভরতনাট্যম উপস্থাপনায় বজ্রসেন ও উত্তীয়ের ভূমিকায় মঞ্চে নামেন অথবা শর্মিলা রায় পোমোর পরিচালনায় যখন ইউনেস্কোর মঞ্চে স্পেনিয় অভিনেতা জেভিয়ার মেস্ত্রেস এমিলিও এবং বেহালা বাদক গ্যাব্রিয়েল লনের সঙ্গে রাজস্থানের কথক নর্তকী শর্মিলা শর্মা কবির নৃত্যনাট্যের প্রযোজনায় দর্শকদের মুগ্ধ করেন কিংবা আমেরিকার সেন্ট লুইসের কুচিপুড়ি শিক্ষক প্রসন্ন কস্তুরী যখন 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্যে'র কন্নড় রূপ 'য়েল্লি মন কলুকিরাডো' দিয়ে রবীন্দ্র-গীত ও নৃত্যের অর্ঘ্য সাজিয়ে ১৫-টি দেশের মানুষের সামনে উপস্থাপন করেন অথবা দেশের প্রথম সারির নাট্য-পরিচালক রতন থিয়াম যখন ইম্ফলে 'রাজা'-র মণিপুরী ভাষার নাট্যরূপ 'শকুদাবা শকনইবা'-র অসাধারণ প্রযোজনা দিয়ে নাট্য-উত্সবের

সূচনা করেন -- তখন মনে হয় পারফর্মিং আর্টসের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে দ্বিতীয় শ্রেণীর শিল্পী বলে অপপ্রচারের যত প্রচেষ্টাই হোক না কেন, ওঁর গান-নাটক-নৃত্য তো বহুদিন ধরেই ভারতের কোনায় কোনায় হয়ে এসেছে -- বিস্মৃতি-পরায়ণ জাতি বলে আমরাই কোনো খবর রাখি না। আজ নয়, ১৯৬৮ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী থেকেই রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন'-এর টি এম বি নেদুনগাডির অনুবাদে মালয়ালম রূপ 'বলিদানম'-এর যে কথাকলি মঞ্চায়নের কথা আমরা ফিলিপ জারিল্লির বই 'The Kathakali Complex: Performance & Structure' থেকে জানতে পারি সেই সব ঘটনার কথা আজ বিতর্কের মুহূর্তে আরো বেশি করে মানে পড়ে। সেই ঐতিহ্য মেনে আজও কেরালার প্রখ্যাত নাট্য-ব্যক্তিত্ব কাভালাম নারায়ণ পানিক্কার-এর রূপান্তরে 'চন্ডালিকা' কিংবা ত্রিচুরের 'রঙ্গচেতনা' গোষ্ঠির প্রযোজনায় কে ভি গণেশের 'রক্তকরবী' বা কাদাম্বাজ্জিপুরমের নাট্যশাস্ত্র দলের নারিপত্ত রাজুর নির্দেশনায় 'বিসর্জন'-এর মঞ্চ-রূপ পালাক্কাডের জাতীয় নাট্যোত্সবের দর্শকদের মোহিত করে - যার খবর আমরা জানতে পারি না।   কিভাবে রবীন্দ্রনাথের রচনা - গান, নাটক ও নৃত্য-শিল্প-কর্ম কোনো-না-কোনো আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত সংগ্রামীদেরকেও সর্বত্র অনুপ্রাণিত করেছে, ঘরের কাছে তার উদাহরণ হল মহিলাদের বিরুদ্ধে চলতে থাকা অত্যাচারের প্রতিবাদে ১৬-দিনের গুয়াহাটিতে রবিজীত গগৈ-এর অনুবাদে ও নির্দেশনায় জির্সং থিয়েটারের 'ইতি মৃণালিনী'-র নাট্য প্রয়োগ। তবে আমরা   আগেও দেখেছি টরন্টোর অভিনেতা-নির্দেশক ঈশ্বর মূলজির 'রক্ত-করবী'-র প্রযোজনা দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ-বিদ্বেষ বিরোধী আন্দোলনের হাতিয়ার হয়ে কিভাবে একজন শ্বেতাঙ্গ নির্দেশকের মঞ্চন-কৃতি রূপে ইউনিভার্সিটি থিয়েটার-এর প্রায় ৩০০০ দর্শকদের নাড়িয়ে দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, 'ডাকঘর'-এর প্রায় শতাধিক ভাষায় অনুবাদ ও প্রযোজনার উদাহরণ হিসেবে আমরা পাচ্ছি । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্যারিসের পতনের আগের রাতে জুন ১৯৪০-এ রেডিও ফ্রান্স থেকে 'ডাকঘর'-এর সম্প্রসারণ - কি ছিল ওই নাটকে যেজন্য ওয়ারশ-র ঘেটোর অনাথালয়ের শিশুদের নিয়ে Janusz Korczak একটা অসাধারণ প্রযোজনা করেছিলেন প্রায় একই সময়ে, যার কিছুদিন পরেই ১৯৪২-এ ওঁকে গ্যাস চেম্বারে ঢুকিয়ে হত্যা করা হয়?

এই প্রসঙ্গে মানে পড়ছে - ১৯২১-এ যখন রবীন্দ্রনাথ প্রথম বার জার্মানি-তে যান প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানির উপর শান্তির ও স্বস্তির প্রলেপের মতই, তখন থেকেই ও-দেশে ওঁর জনপ্রিয়তার শুরু যা থামানোর জন্য পরে নাত্সী শাসক সম্প্রদায়কে বিশেষ ফরমান জারি করতে হয়েছিল। তাতে কিছুদিন অনুবাদের ধারা বন্ধ ছিল বটে - তবে রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভক্ত অনুবাদিকা হেলেন-মেয়ের ফ্রাঙ্ক তাকে আবার পুনরুজ্জীবিত করেন - যদিও আরনসনের মত ওঁর পক্ষে ভারতে আসা কিছুতেই সম্ভব হয় নি বিদেশী শাসকের বিরোধিতার ফলে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ এলো বলে বলতে হয় আলেক্স আরনসনের কথা - গত বছর যাঁর শত বার্ষিকী গেল, যিনি গুরুদেবের আমন্ত্রণে ও ব্যবস্থাপনায় ১৯৩৭ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত শান্তিনিকেতনে ইংরেজি সাহিত্য পড়ানো ছাড়াও সারা পৃথিবীতে কবির ভ্রমণের পর দেশ-বিদেশের কাগজে যে খবর, বর্ণনা ও আলোচনা ছাপা হয়েছিল তার বিস্রস্ত ও স্তূপাকৃতি জমা কাগজকে সুষ্ঠু ভাবে গুছিয়ে শ্রেণী বদ্ধ করে পরবর্তী কালের রবীন্দ্র গবেষকদের জন্য এক অমূল্য সম্পদ ছেড়ে গেছেন।একজন জার্মান ইহুদী হিসেবে দেশ ছেড়ে পালিয়ে আসা ছাড়া ওঁর মত বুদ্ধিজীবির আর কোনো উপায় ছিল না - তবে সেযুগে তাঁর পক্ষে ব্রিটিশ-শাসিত ভারতে ঢোকাটাও সহজ ছিলনা । দার্শনিক উইট্টগেনস্টাইন, ল্যাটিন আমেরিকার পাবলো নেরুদার মত কবি , বা মরিশাসের ফরাসী কবি লেওভিল ল'ম অথবা ঔপন্যাসিক রবার্ট এডওয়ার্ড হার্টের মতন না-জানি কত সহস্র লেখক-কবি রয়েছেন সারা পৃথিবীতে যাঁদের উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ছিল অসীম। গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে আরনসন স্মরণ করেন নিজের জীবন-স্মৃতিতে ওঁর সঙ্গে কবির প্রথম সাক্ষাতের কথা (যা বন্ধুবর মার্টিন কাম্পচেনের একটি লেখা থেকে উদ্ধৃত করে দিলাম): “I recall how deeply impressed I was by his voice, his physical appearance, the utter simplicity of his arguments which were less literary than human. I listened without interrupting him. I was, naturally, much too intimidated to contradict or to argue. That first interview lasted half an hour. By the time I left his room, darkness had fallen. I was as if intoxicated by the warmth of his voice, the shape of his hands, the sensuous perfection of his face.”

আজকে রবীন্দ্রনাথের চলে যাওয়ার সাত দশকেরও বেশি পর বেশ কয়েকটি মহাদেশে ওঁর সৃষ্টি-কর্মের নানান দিক নিয়ে বলতে গিয়ে অথবা ওঁর আঁকা ছবির বিশ্ব-ব্যাপী প্রদর্শনীর আয়োজন করতে গিয়ে এখনও যত উত্সাহী পাঠক, দর্শক, শ্রোতা ও বুদ্ধিজীবীকে পেয়েছি - তাতে মনে হয়েছে কোথাও সব দেশের সর্ব কালের মানুষকে ছুঁয়ে যাওয়ার জাদু ওঁর প্রতিটি শিল্প-কর্ম সাহিত্য ও রচনায় হয়ত ছিল; তা-নাহলে 'তাসের দেশ'-এর ওয়াটার-ব্যালের মতন পরীক্ষা-নিরীক্ষা, জেলের বন্দিদের প্রযোজনায় 'বাল্মীকি প্রতিভা' বা মূক-বধির শিশুদের 'ডাকঘর' - এমন সব 'পাগলামো' আজও কেন আমাদের প্রাণকে স্পর্শ করে?

*এই লেখাটি পরবাস ওয়েব ম্যাগাজিনে একই সময় প্রকাশিত হয়েছে।

অধ্যাপক উদয় নারায়ণ সিংহ বর্তমানে এমিটি বিশ্ব-বিদ্যালয় গুড়গাঁও-এ ভাষাবিজ্ঞানের চেয়ার-প্রফেসর - এর আগে বিশ্ব-ভারতী, শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র ভবনে অধ্যাপনা করেছেন ও বিশ্ব-ভারতীর সহ-উপাচার্য ছিলেন; ভারতীয় ভাষা সংস্থান, মহিশূরের অধিকর্তা ছিলেন - পড়িয়েছেন বরোদা, সুরাট, দিল্লী ও হায়দ্রাবাদ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে. বাংলা ও মৈথিলীতে কবিতা ও প্রবন্ধ লেখেন. ২০১৮ সালে কবিতার জন্য সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন. প্রায় ৫৬ টি বই আর প্রচুর গবেষণা পত্র প্রকাশিত. ন্যাশনাল ট্রান্সলেশন মিশন-এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন. প্রায় তেইশটি দেশে বক্তৃতা দিয়েছেন।

ঈশ্বরের প্রতি বাঙালীর ভালবাসার প্রতীক দেবীদুর্গা মাতা

অমীয়া ব্যানার্জী

পশ্চিমবঙ্গ, ভারত এবং পৃথিবীর বড় শহরে বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা ভক্তিভাবে পূজিত হয়ে থাকে। পরন্তু, সর্ব পূজার মধ্যে বিশেষভাবে দুর্গাদেবীর পূজা আত্মিক এবং হৃদয়পূর্ণ। আমরা এই ধার্মিক অনুষ্ঠানের সীমা অতিক্রম করে, আধ্যাত্মিক বিচার ধারায়, দুর্গাপূজা, হৃদয়ের হৃদ-প্রদেশে এক চরম ও পরম প্রাপ্তির প্রলেপের ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে। দেবীর মর্মর মূর্তি, অমৃত রূপে আমাদের আকৃষ্ট করে এবং দেবীর ঐ মূর্তির মধ্যে সঞ্চারিত বিভিন্ন দেবতার শক্তির সমাবেশ, মানব -মন কে ঈশ্বরীয় ভাবে ভাবিত করে তোলে।

দেবীর সম্মুখে গমনের পর, প্রত্যেক ভাষাভাষীরা এক নৈসর্গিক, দৈবিক স্থিতির জন্যই আশ্বিন মাসে কোনও এক বিশেষ পূজাস্থলে সমবেত হয়। প্রার্থনা, নিবেদন এবং অন্তিমে, পূজার বিশেষ পুষ্পাঞ্জলি। করজোড়ে পুষ্প গ্রহণের পর গম্ভীর মন্ত্রধ্বনি, প্রত্যেক ভক্তের হৃদ বীণাতে যে অদ্ভুত ঝঙ্কার ধ্বনি সৃষ্টি হয় তা বর্ণনাবিহীন।

ভগবদ্গীতাতে একটি শ্লোক আছে, "পত্রম্, পুষ্পম্, ফলম্, তোয়ম্"।

এই শব্দগুলির বাংলা অনুবাদ যথাক্রমে, 'পত্রম্ = বেল্ পাতা অথবা তুলসী পাতা', 'পুষ্পম্ = বিভিন্ন প্রকার ফুল', 'ফলম্ = ভিন্ন ভিন্ন ফল', এবং 'তোয়ম্ = গঙ্গা বা শুদ্ধ জল'। বেল পাতা, ফুল, ফল এবং গঙ্গাজল ইত্যাদি দ্বারা দেবীর অর্চনা করা হয়।

এবার এই শব্দ গুলির আধ্যাত্মিক অর্থঃ

(১) পত্রম্ – এই মানব দেহ পত্রের ন্যায়, যা একদিন জ্বলে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাই পত্ররূপী দেহকে দেবীর চরণ কমলে অর্পন করাই জীবনের লক্ষ্য।

(২) পুষ্পম্ – মানবের হৃদয়কে হৃদ-কমল বলা হয়। ঐ কমল রূপী হৃদয়কে ঈশ্বরের চরণে নিবেদনই প্রকৃত দেবী পূজা। নৈসর্গিক সৃষ্টির ফুল, তাকে চয়ন না করে, তাকে প্রকৃতির কোলে অধিক সুন্দর নামে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'লও তার মধুর সৌরভ, ছুঁয়ো না তাহারে'।

(৩) ফলম্ – ফল অর্পন করলে ফল লাভ হবে, এই কামনা বাসনায় জর্জরিত জগতের জীবাত্মা ভগবানকে ফল প্রদান করে থাকে। অর্থাৎ সন্তান এবং সমগ্র পরিবারের জাগতিক সুখের এবং শান্তির চিন্তায় বিব্রত মানুষ সৃষ্টির রচিত ফল ঈশ্বর-অর্পন করে।আশ্বস্ত হয় যে ভগবান তার ইচ্ছার পূরণ করবেন। কিন্তু দেবীর কোন ফল কামনা বা বাসনাই নেই। সুতরাং, আমার মতে জগতের 'চাই, চাই এবং নাই, নাই' পরিত্যাগ করে প্রার্থনা হোক, 'হে মাতা, শুধু তোমাকে চাই, আমার আর কিছুই চাই না'। বেদের ভাষায়, 'অকামো, বিষ্ণু, কামো বা'। অর্থাৎ, জগতে কেবলমাত্র চাওয়া এবং পাওয়া। পরন্তু, ভগবান বিষ্ণুকে চাওয়া, তা কামনা নয় কিংবা বাসনা নয়।

(৪) তোয়ম্ – মানবের ধারণা, গঙ্গা জল স্নান, হাত ধোয়া কিংবা কম করে অল্প একটু গঙ্গাজল মস্তকে অর্পন করলেই দেহ, মন্, চিত্ত এবং বুদ্ধি শুদ্ধ বা পবিত্র হয়ে যাবে। অস্থি, রক্ত এবং মাংসের দ্বারা গঠিত এই দেহও কামনা, বাসনা, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, লোভ, হিংসা, জ্বালা, যন্ত্রণা এবং অহঙ্কারে জড়িত এই দেহকে পরিষ্কার করবার একমাত্র উপায় ইশ্বরের কাছে ক্রন্দন। ক্রন্দনের ধ্বনিতে মানবের মন বিগলিত হয়। ইশ্বরের জন্য নিষ্কাম ক্রন্দনে দৈবিক ধারাতে ভক্ত জগৎ থেকে মুক্ত হয়ে সদা সর্বদা ইশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়।

পুষ্পাঞ্জলি অর্পণের পর ভক্ত নীরবভাবে অমূর্ত মূর্তি পদে অশ্রু সিক্ত নয়নে দেবীর দর্শন করে। দেবী তাঁর তেজপুঞ্জ রাশিতে ভক্তকে সিক্ত করেন। নীরবতাকে নীরবতার দ্বারা বা মূক অবস্থার দ্বারা দেবীর কল্যাণ রূপী আশীর্বাদ ভক্তও অনুভূতি করে। এই অবস্থাকে মৃতাবস্থা বোধের স্থিতি বলা হয়।

এই জগতে মানুষ তিন অবস্থায় বিচরণ করে।

(১) বিষয়ানন্দ (২) ভজনানন্দ (৩) ব্রহ্মানন্দ

(১) এই মরজগতে যে জীব ভগবানের কাছে এসে বিষয়ের বিষ নিয়ে আলাপ আলোচনা করে, বাহ্যিক আনন্দ করে, তারা হলেন ‘বিষয়ানন্দ’।

(২) যে ভগবৎ ভক্তরা ঈশ্বরের নাম গুণগান, ভজন, কীর্তন, গান ও বাজনা ইত্যাদি নিয়ে মনে ও প্রাণে ক্ষণিক মনোরঞ্জনে আনন্দ সৃষ্টি করে উপভোগ করেন, তারা হলেন ‘ভজনানন্দ’।

(৩) তৃতীয় অবস্থা ব্রহ্মানন্দ। যে ঈশ্বরপ্রেমী ভগবৎ প্রেমে পাগল বা মাতোয়ারা অবস্থায় দৈবিক স্থিতি অনুভব করে, তখন ভক্তের হৃদয়ে যে চিরন্তন আনন্দের সৃষ্টি হয়, তা হল ‘ব্রহ্মানন্দ’। মনের লয় অবস্থা হলে ‘সমাধি’ স্থিতি লাভ। সাধক দেবীর মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে এক পলকের কিংবা মুহূর্তের জন্যও ‘ব্রহ্মানন্দ’ উপভোগ করে।

শ্রীমতি অমীয়া ব্যানার্জি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অনেক বই পড়েছেন এবং এই সম্পর্কিত অনেক বক্তৃতা শুনেছেন রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে।

স্বামী বিবেকানন্দের কিছু কথা

অর্ণব দাশগুপ্ত

"নিজের বুদ্ধি এখন কিছুদিন খরচ করবে না। পাছে ফুরিয়ে যায় - কিছুদিন পরে করো।"

বুদ্ধি খরচ করলে ফুরিয়ে যায় - শুনেছেন কখনো? এ কথা কে বলতে পারে বলে আপনার মনে হয়?

যদি বলি আমার বস আমাকে এটা বলেছিলেন আমি নতুন চাকরিতে যোগ দেবার পর - বিশ্বাস যোগ্য - তাইতো? কিন্তু না। যিনি বলেছিলেন, বা লিখেছিলেন তিনি যে সে ব্যাক্তি নন - স্বামী বিবেকানন্দ। লিখছিলেন (২৯শে জুলাই, ১৮৯৭) গুরুভ্রাতা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে - যার পূর্বের নাম শশী। [1]

শশী মহারাজ মাদ্রাজ (অধুনা চেন্নাই) মঠের প্রতিষ্ঠাতা - সেখানে কিভাবে কাজ করতে হবে সেই প্রসঙ্গে উপরের কথাটি বলা - ভ্রাতৃসূলভ শাসন স্বামীজির প্রিয় গুরুভাই শশীকে। শশী মহারাজ তাঁর ইচ্ছানুযায়ী পূজা ইত্যাদির উপর বেশি নজর দিচ্ছিলেন কিন্তু স্বামীজি বুঝেছিলেন কিছু ত্যাগী ছেলে দরকার। তাই বললেন "মঠে ছেলেপুলে যোগাড় হচ্ছে কি? যদি হয় তো কলিকাতায় যেভাবে কার্য হচ্ছে, ঠিক সেইভাবে করে যাও। নিজের বুদ্ধি এখন কিছুদিন খরচ করবে না। পাছে ফুরিয়ে যায় - কিছুদিন পরে করো।"

বুদ্ধি খরচ করলে ফুরায় না - ঐটি স্বামীজির রসিকতা – কিন্তু উপদেশটি – যেখানে বলতে চেয়েছেন শশী মহারাজ যেন তাঁর নিজের বুদ্ধি খরচ না করে স্বামীজির কথামতো কিছুদিন কাজ করেন - অমূল্য। অভিজ্ঞ শিক্ষক বা সহকর্মীর সহায়তা শুরুতে অসম্ভব কাজে লাগে - ছাত্রজীবনে তো বটেই - সেখানে শিক্ষক থাকেন। আরও প্রয়োজন হয় চাকুরী জীবনে। যত দিন যাচ্ছে - কর্মক্ষেত্রে জটিলতা বাড়ছে আর বাড়ছে পুঁথিগত শিক্ষা আর চাকুরীক্ষেত্রে কাজের মধ্যে ফারাক। এখানে স্বামীজি কাজ শেখার জন্য যে obedience প্রয়োজন তারই নির্দেশ দিয়েছেন।

আর একটি চিঠিতে (৩০শে জুলাই, ১৮৯৭) আর এক গুরুভাই স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখছেন "It is better to wear out than rust out " - মরচে পড়ে পড়ে মরার চেয়ে ক্ষয়ে ক্ষয়ে মরা ভালো। এটি অবশ্য Richart Cumberland -এর (১৬৩২-১৭১৮ খ্রী:) উক্তি। গুরুভাইদের কিভাবে কাজ করতে motivate করতেন তাঁর চিঠিগুলি পড়লে বোঝা যায় আর আজও উৎসাহ পাওয়া যায়।

Leadership বা নেতৃত্ব দেবার রহস্য কি তা লিখেছিলেন সিস্টার নিবেদিতাকে (১লা অক্টোবর, ১৮৯৭)। "অনেকে অপরের নেতৃত্বে সবচেয়ে ভালো কাজ করতে পারে। সকলেই কিছু নেতা হয়ে জন্মায় না। কিন্তু শ্রেষ্ঠ নেতা তিনিই, যিনি শিশুর মতো অন্যের উপর নেতৃত্ব করেন। শিশুকে আপাততঃ অন্যের উপর নির্ভরশীল বলে মনে হলেও সেই সমগ্র বাড়ির রাজা। অন্ততঃ আমার ধারণা এই যে, এই হলো নেতৃত্বের মূল রহস্য - অনুভব অনেকেই করে সত্য, কিন্তু জন কয়েকেই মাত্র প্রকাশ করতে পারে। অন্যের প্রতি অন্তরের প্রেম, প্রশংসা ও সহানুভূতি প্রকাশ করার যে ক্ষমতা, তাই এক জনকে অপরের অপেক্ষা ভাবপ্রচারে অধিক সাফল্য দান করে। " ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব বা বেদান্তের ভাবপ্রচারের কথাই তখন তাঁর মাথায় - তাই

ভাব প্রচারের কথা লিখেছেন। যে কোনো কাজে নেতৃত্ব দেবার ক্ষেত্রেই কথাটি প্রযোজ্য। নেতৃত্ব তাঁরাই ভালো দিতে পারেন যাঁদের আদেশেও প্রেম প্রশংসা ও সহানুভূতি মিশে থাকে।

এর পরে ওই একই চিঠিতে যা লিখেছেন তা আরও বিস্ময়কর। বলছেন: "বড় অসুবিধা এই - আমি দেখতে পাই - অনেকে তাদের প্রায় সবটুকু ভালোবাসা আমাকে অর্পণ করে; কিন্তু প্রতিদানে কোনো ব্যক্তিকে আমার তো সবটুকু দেওয়া চলেনা; কারণ একদিনেই তা হলে সমস্ত কাজ পন্ড হয়ে যাবে। নিজের গন্ডির বাইরে দৃষ্টি প্রসারিত নয় - এমন লোকও আছে, যারা ঐরূপ প্রতিদান চায়। কর্মের সাফল্যের জন্য যত বেশি সম্ভব উৎসাহপূর্ণ অনুরাগ আমার একান্ত প্রয়োজন; অথচ আমাকে সম্পূর্ণভাবে সব গন্ডির বাইরে থাকতে হবে। নতুবা হিংসা ও কলহে সব কিছু ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। নেতা যিনি, তিনি থাকবেন ব্যক্তির গন্ডির বাইরে।"এই কয়েকটি ছত্রে লিডারশিপ যে কতটা impartial হওয়া উচিত তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। তুমি আমার কাজ করো - কিন্তু বিনিময়ে আমি তোমাকে বেশি attention দিলে যারা সেই attention পাচ্ছেনা তাদের সাথে তোমার বিভেদ তৈরী হবে। এ একরকমের ত্যাগ। বর্তমান যুগে যাঁরা উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত - তাঁরা কি impartial হন বা এই চেষ্টা করেন যাতে কর্মীদের মধ্যে বিভেদ না হয়? ইন্টারনেটে একটু খুঁজেই একটি লিংক পেলাম যা বলছে A leader has to be having a fair outlook which is free from bias and which does not reflect his willingness towards a particular individual. He should develop his own opinion and should base his judgment on facts and logic. He should be impartial to his subordinates. [2] স্বামীজি সেই যুগে আর মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সে যা বলে গেছেন তা আজও কি বিস্ময়করভাবে গ্রহণযোগ্য।

আপ স্টেটে আমরা যারা বাস করি তাদের সৌভাগ্য দুটি তীর্থস্থান তাদের বড় নিকটে। একটি রিজলী [3] এবং অপরটি বিবেকানন্দ কটেজ । [4] রিজলী স্টোন রিজে আর বিবেকানন্দ কটেজ ওয়েলেসলি আইল্যান্ড-এ। দুটি জায়গাতেই স্বামীজি বাস করে ছিলেন। একটি মজার ঘটনা দিয়ে শেষ করি। রিজলী তে থাকার সময়ে লেগেট পরিবারের সঙ্গে dinner করতে হতো। স্বামীজির খাওয়া শেষ হতো দ্রুত এবং তারপরেই উশখুশ করতেন ওঠার জন্য। সেটি বুঝতে পেরেই গৃহকর্ত্রী ঘোষণা করতেন "এরপর আসবে চকোলেট আইস ক্রিম। " বাধ্য ছেলের মতো শান্ত হয়ে বসতেন দুরন্ত দামাল সন্ন্যাসী। [5]

তথ্যসূত্র :

[1] পত্রাবলী, স্বামী বিবেকানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৬৪

[2] https://iedunote.com/great-leader-qualities

[3] www.ridgely.org

[4] https://www.ramakrishna.org/activities/TIP/visitors_info.htm

[5] লেখকের কথপোকথন শ্রদ্ধেয়া প্রব্রাজিকা শুদ্ধাত্মাপ্রাণার সঙ্গে, রিজলী ম্যানর, স্টোন রিজ, নিউ ইয়র্ক

অর্ণব দাসগুপ্ত আপ্ স্টেট নিউ ইয়র্কের ইউটিকা নামে একটি শহরে স্ত্রী দীপা ও পুত্র অর্পণ কে নিয়ে ২০০২ সাল থেকে বাস করছেন । অর্ণব কবিতা লিখতে ভালবাসেন এবং তাঁর কবিতাতে অন্ত্যমিলের ব্যবহার করেন

রবীন্দ্রনাথ ও একাকীত্বের আরাধনা

বিরূপাক্ষ পাল

বহু জনপ্রিয়তার মাঝেও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একা । একাকীত্বের আরাধনাই ছিল তাঁর জীবনের পরমার্থ। জমিদারকুলে জন্ম নিয়েও "সামান্য ক্ষতি" বা " দুই বিঘা জমি"র এই লেখক প্রথাগত জমিদার হতে পারেননি। ঠাকুর বংশের এই নাট্যকার তাঁর 'রথযাত্রা'য় রথের ভার দিয়েছেন শূদ্রের হাতে। জন্ম ও পারিবারিক প্রেক্ষিতের কাছেও তিনি ছিলেন পলাতক। একা থাকার তাগিদেই। সর্বহারার উত্থান কামনা করেছেন। কিন্তু সর্বহারা সংগঠনে ভিড় করেননি। যখনই কোথাও ভিড় বেড়েছে, তিনি ঋষির মতো সরে গেছেন অন্যত্র—নিভৃতে—প্রকৃতির প্রশান্ত কোপে একাকীত্বের আরাধনায়। পরম আকুলতায় অন্তর থেকে উচ্চারণ করেছেন---

কথার পাকে কাজের ঘোরে ভুলিয়ে রাখে কে আর মোরে ,

তার স্মরণের বরন মালা গাঁথি বসে গোপন কোণে ॥

আমায় থাকতে দে-না আপন -মনে ।"

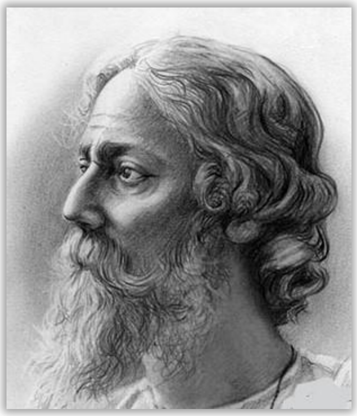

রবীন্দ্রনাথের ছিল জীবন, সমাজ, সংসার। প্রথাগত নিয়মে সবই। কিন্তু তিনি একজন সার্থক সংসারী বৈরাগী। স্ত্রী মৃণালিনীর কাছেও ছিলেন অনাবিষ্কৃত। যদিও মানুষকে আশ্বস্ত করেছেন -" বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয় / অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় ।" কিন্তু বন্ধ ঘরের মাঝেই বন্ধনকে জয় করেছেন। কন্যার মৃত্যুতে রথ ঘুরিয়ে নিয়েছেন সেই আদিগত একাকীত্বের পথে। অনুভব করেছেন –" এ পথে আমি-যে গেছি বার বার, ভুলি নি তো এক দিন ও ।" কিন্তু তাঁর এই নিরন্তর যাত্রা ছিল সদাই সঙ্গী বিহীন। সে কথাও তিনি বলেছেন একই গানে –" একেলা যেতাম যে প্রদীপ হাতে নিবেছে তার শিখা / তবু জানি মনে তারার ভাষাতে ঠিকানা রয়েছে লিখা। "

রবীন্দ্রনাথের একাকীত্ব প্রিয়তার খুব সহজ উচ্চারণ কি সেই " তবে একলা চলো রে গানটি ? আসলে তাঁর এ গানটি প্রায়শই অপব্যাখ্যার শিকার। এইটির সাথে প্রকৃত একাকীত্বের ধারণা এক করা যায়না। গানটি তিনি লিখেছেন 'স্বদেশ' কাব্যে যার মূল সুর অন্যায়ের সমষ্টিগত বা সম্মিলিত প্রতিরোধ। স্বদেশের স্বাধীনতায় সম্মিলিত যুদ্ধের আহ্বান। তবে এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের সংগ্রাম পথে কখনো কখনো একলা চলতে হলেও আমরা যেন পিছ পা না হই। এটিই এই গানের মূল সুর। সংগোপন সাধনার মুল সুর ধ্বনিত হয়েছে তাঁর 'পূজা' ও 'প্রেম' কাব্যে। এ দুটো কাব্যই রবীন্দ্র ভাবনার মূলধারা। এখানেই রবীন্দ্রনাথকে চেনা যায় এক নিবিষ্ট যোগী হিসাবে। তাঁর এই নির্জন জগতেই ঈশ্বর কখনো প্রেমিক, কখনো বন্ধু। এখানে সমষ্টিগত আর কারো প্রয়োজন তিনি অনুভব করেননি। সহজ কথায় একক জগত গড়েছেন। বাহ্যিক জগতের ভিড় ধার করেননি। " আপন মনে গোপন কোণে লেখাজোখার কারখানাতে"-মত্ত রয়েছেন। সকল জনম ভরে একজন দরদিয়া বন্ধুকে অনুভব করেছেন অন্তরের কথোপকথনে। এটিই তাঁর সমাজ, এটিই তাঁর সাহচর্য

একাকীত্বকে পরমার্থ করে রবীন্দ্রনাথ কি স্বার্থপর হয়েছিলেন ? সে বিচারের ভার সাধ্যের অতীত । তবে রবীন্দ্রনাথ সেভাবে একাকী না হলে আমরা অমূল্য সম্পদ থেকে বঞ্চিত হতাম । তাঁর একাকীত্ব কষ্টের বৈকি । তবে তাঁর সাধনার সাফল্যে মনুষ্য অনুভূতি পেয়েছে অমৃত সম্পদ ।

"জীবন মন্থন বিষ নিজে করি পান । অমৃত যা উঠেছিল করে গেছ দান। "

বিরূপাক্ষ পালের জন্ম নদীমাতৃক বাংলাদেশের এক গ্রামে । ময়মনসিংহের নালিতাবাড়ি-সেখান থেকে মেঘালয়ের গারো পাহাড় দেখা যায় । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির এই স্নাতক একসময় অস্ট্রেলিয়ায় পাড়ি জমান । সেখান থেকে বিংহামটন এসে পি এইচডি শেষে বর্তমানে পড়াচ্ছেন কোর্টল্যান্ডে, নিউ ইয়র্ক স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ে । প্রিয় বিষয় সঙ্গীত, প্রকৃতি ও ভ্রমণ । মাঝে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে প্রধান অর্থনীতিবিদের দায়িত্বে ছিলেন । তাঁর লেখা বইগুলোর মধ্যে রয়েছে সিডনির পথে পথে, দ্বন্দসূত্র ও বিতর্ক ভুবন ।

বাঙ্‌-ময়ী

যযাতি কহেন

সূর্যের চোখ এখন ঢুলুঢুলু - আলস্যের আড়ালে ম্লান। পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে যত দুঃখ, যত কষ্ট, যত বিষাদভরা ব্যর্থ প্রেমগাথা আছে, সব কে যেন ছড়িয়ে দিয়েছে সবুজ ঘাসের ওপর এই হেমন্তের একলা দুপুরে। সব মিলে একটা কেমন কুয়াশার মত হয়েছে। চোখ চলে না যেন। মন চলে শুধু। চলতেই থাকে। রেললাইনের পাড় ধরে, টিলা, ধানক্ষেত, খাল, বিল ফেলে, পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে কোন অজানা অচিনপুরে। কোথাও কোন মানুষ-জন নেই। কোথাও কোন শব্দ নেই। এ কোন রাজ্য? রাস্তা ঘাট, আলো, বাড়ী সবই আছে। কিন্তু শব্দ নেই। চোখে শূন্য দৃষ্টি নিয়ে বসে আছে দুপুর। একলা দুপুর। মুখে বট ফলের ম্লান বিষণ্ণতা। শব্দের লোভে ঘুরছি আমি। শব্দ যোগাযোগের সুত্র - মানুষের সঙ্গে মানুষের, পাখির সাথে পাখির, মানুষের সাথে পাখির-ও কি? শব্দ যোগাযোগের সুত্র - আমার সঙ্গে তার। আমার সাথে সেই তার যার খোঁজে এক পথহারা পথ ধরে হেঁটে চলে গেছি অনন্ত রাত্রিকাল ধরে। অধরা রয়ে গেছে তাও, আশ্লিষ্ট রয়ে গেছে অতৃপ্ত প্রাণ। শব্দের একটা রঙ আমি আজীবন দেখেছি। একটা কাচের বোতলে ভাগিরথীর জল ভরে আনলে তার যে রকম ঘোলা রঙ হয় সেই রকম। সেই রংটার আঁচড় দেখছি না কোথাও। কোন দুষ্টু এসে ধুয়ে দিয়ে গেল বুঝি, নাকি আমি বর্ণান্ধ হয়ে গেছি? আমি প্রাণপণে খুঁজি। খুঁজতে খুঁজতে পাই সেই রাজবাড়িটা। ওই শ্রদ্ধাবনত অশ্বত্থ গাছটা শব্দহীন ভাষায় জানিয়ে দিল, তাই বুঝলাম - ওটা রাজবাড়ি। নয়ত ওই বুঝি রাজবাড়ি? ইট বিবর্ণ, শ্যাওলা পড়া, কোথাও কেউ নেই। ছিঃ। কিন্তু আমি নিরুপায়। শব্দের খোঁজে ঢুকে পড়ি রাজবাড়িতে। শব্দ যে আমায় পেতেই হবে। আমি পৃথিবীর কারো সাথে কখনো যোগাযোগ করিনি। শব্দ নেই বলে। সূর্য যেমন আলো দেয়, আমি তেমন জল দিতে চাই। শব্দ-জল। আমার মধ্যে শব্দ-সাগর আছে। তার থেকে কিছুটা। কিছুটা কেন, সবটা। নিজেকে উজাড় করে দিতে চাই, যেমন দধীচি দেয়। আমি কি আজকের সূর্যটার মত কৃপন নাকি? পাজিটাকে দেখো। এতো আছে, তবু দিচ্ছে কম। মাপজোক করে, হিসেব করে, একটুখানি আলো - যেন এই বুঝি ফুরোবে। আমি অমন নই। আমি সবাইকে ভিজিয়ে দিতে চাই। সবাইকে ইলশে-গুড়ি শব্দ বৃষ্টিতে ভিজিয়ে দিতে চাই। শব্দের খোঁজে আমি রাজবাড়িতে ঘরের পর ঘর, ঠাকুরদালান, শোবার ঘর, রান্নাঘর, বৈঠকখানা সব ঘুরে ফেললাম। নাঃ কোথাও নেই এতটুকু শব্দ। সব রঙ আছে, কিন্তু ওই ঘোলা রংটা নেই কোনখানে।

খুঁজতে খুঁজতে আমি চিলেকোঠায়। এখন শুনতে পাচ্ছি আমি। শব্দ। না, না শব্দ না। ধ্বনি। গান। ধ্রুপদী সঙ্গীতের মিড়। তানপুরার ছড়। বাসন্তী রঙা শাড়ি পড়ে বসে একটা মেয়ে গান গাইছে - রাজকন্যা কি? হয়তো বা। ওর দুই দীর্ঘ আনত নয়ন যেন পদ্মকোরক। ওর উপস্থিতি ক্ষীণ ফল্গু ধারার মত দু দন্ড শান্তির অবসর। আমায় দেখেই ওর চোখ পদ্মপাতার মত ভারী। বিস্মিত হল না, চঞ্চল হল না আঁখি। যেন কতকাল ধরেই জানত আমি আসব, এই শব্দহীন দুপুরে শব্দের সন্ধানে আমার এই আসা এ যেন কতকাল আগে থেকে বিধাতার অনিবার্য লেখনিতে লেখা হয়ে আছে। আমার মনে হল সব্বাই - এই রাজবাড়ি, এই অশ্বত্থ গাছ, ওই কিপটে সূর্য, সব্বাই জানত আজ এই মুহূর্তে আমি এখানে আসব।

আমার চোখে জল। সারা জীবন ধরে আমার যে শব্দের খোঁজ সে শব্দ এখন আমার সামনে। আমি দেখতে পাচ্ছি। শব্দকে কি দেখা যায়? শব্দের ঘোলা রং আমি দেখেছি আজন্ম। কিন্তু এ অন্য শব্দ। এই ঘরের অণুতে পরমাণুতে যে শব্দ তার রঙ ঘোলাটে নয়, উজ্জ্বল শুভ্র বর্ণ। আমি দেখতে পাচ্ছি ঘরটা কেমন শ্বেতবর্ণা শব্দে টইটুম্বুর। বুঝতে পেরেছি শব্দের পাত্তা নেই কেন আর কোনখানে। সব...সব শব্দই যে শুষে নিয়েছে এই চিলেকোঠার ঘরটা। ওই রাজকন্যার গলা থেকে বেরোন প্রতিটা সুর, প্রতিটা শব্দ এত সান্দ্র যে এই চিলেকোঠার ঘর থেকে বেরতে পারেনি। কোন বিস্মৃত অতীত থেকে ও গান গেয়ে চলেছে। হাতে বীণা। কে যেন ভাষাহীন ভাষায় বলে গেল বীণাটার নাম কচ্ছপী। ব্রহ্মান্ডের আদিতে যে শব্দ, অনাদি যে শব্দ, অনুচ্চারিত যে শব্দ, অনাহত শব্দ। শব্দের টানে শব্দ বেরোতে পারেনি এ ঘর থেকে। ছড়িয়ে পড়তে পারেনি বিশ্বময়। সবটুকু ওখানেই জমা হয়ে আছে। প্রতিটি সেকেন্ডে বেরোন শব্দ, প্রতিটি মিলি সেকেন্ড, মাইক্রো সেকেন্ড, ন্যানো সেকেন্ডে বেরোন শব্দ জমা হয়েছে প্রতিটি মিনিট ধরে, দিন ধরে, বছর ধরে, শতাব্দী ধরে, যুগ ধরে। সে যে কত গাঢ় শব্দের কুয়াশা সে আমি বোঝাতে পারব না। - আমি দাঁড়িয়ে আছি তার মধ্যে। ওই গাঢ় কুয়াশার মধ্যে আমি হারিয়ে যাচ্ছি, হারিয়ে যেতে যেতে আনন্দ পাচ্ছি। আমার সমস্ত অস্তিত্ব ঐ শব্দ সমুদ্রে বিলীন হয়ে যাচ্ছে - তবু আমার মধ্যে বাঁধভাঙ্গা উল্লাস। আনন্দের তীব্র অভিঘাতে আমার শরীর চুর্ণ বিচুর্ণ হয়ে যাচ্ছে। আমার নিঃশ্বাস নিতে

কষ্ট হচ্ছে। নাকি নিঃশ্বাস নিতে ইচ্ছে করছে না? এই শব্দের সৌন্দর্য - এরই তো টানে সে আসবে, আমার সাথে যোগাযোগ হবে - আমার কাঙ্ক্ষিত, পরম কাঙ্ক্ষিত। কিন্তু কে সে? কে জানে?

আচ্ছা শব্দের সৌন্দর্য মানে কি? মানে রূপসী শব্দ। লজ্জায় রাঙ্গা হয়ে থাকা গ্রীষ্মকালের কৃষ্ণচূড়া গাছের মত সুন্দর। আমরা সবাই তো সুন্দরকেই খুঁজি। এই শাশ্বত অনুসন্ধান থেকেই তো পৃথিবীর সমস্ত রকম কর্ম পরিচালিত। সমস্ত পুণ্য, সমস্ত পাপ, সমস্ত ভালবাসা, সমস্ত সাধনা। আসলে সুন্দরকে ভালবাসাই পৃথিবীর একমাত্র Driving Force. আসলে সুন্দর আর ভালবাসা তো আলাদা কিছু নয়, একে অপরের প্রতিশব্দ মাত্র। মানুষ সুন্দরকেই শুধু ভালবাসে - সে সৌন্দর্য কখনো দেহের, কখনো মনের, কখনো ব্যক্ত, কখন গুপ্ত। আবার মাঝে মাঝে সেই ভালবাসা ঘনীভূত হয়ে বেশ একটা সুন্দরকে তৈরী করে। গাছের ভালবাসা ফুল হয়ে ফোটে। শুঁয়োপোকা নিজেকে নিজে ভালবেসে প্রজাপতি হয়ে যায়। মানুষ মরে গেলে নাকি তার সারা জীবনের ভালবাসা জমে জমে তারা হয়ে ফোটে। সুন্দর চিরকালই ভাববহ হয়, অর্থবহ নয়। আর তাই কোন বিশেষ অর্থবহন না করেও এই শুভ্র শব্দ-মেঘমালা অপ্রতিম বাঙময়।

আমি মাথা অব্দি ডুবে গেছি শব্দে। শব্দসমুদ্রের হাজার হাজার ফুট তলায় তলিয়ে যাচ্ছি আমি। হঠাৎ ভয় হল। মনে হল সৌন্দর্যে হারিয়ে যাব বলে তো আমি আসি নি। আমি যে পৃথিবীকে কথা দিয়ে এসেছি কিছু শব্দ নিয়েই আমি ফিরে আসব। আমার যে শব্দ-তৃষ্ণার্তদের জল দেওয়ার কথা ছিল। তারপর সবটুকু দেওয়া হলে সে আসবে আমার কাছে। আমায় নিয়ে যাবে তার অরূপ শব্দের জগতে। এখন তো আমার হারিয়ে গেলে চলবে না। ভুস করে ভেসে উঠলাম। যেখানটায় উঠলাম, তাকে কেন্দ্র করে বৃত্তাকৃতি শব্দ স্রোত ক্রমশ বড় হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। দেখলাম দূরে এক রাজহাঁস উড়ে যাচ্ছে। পিঠে সেই ব্রহ্মবাদিনী রাজকন্যা কি? জানি না। হাতে মুঠো করে যতটা পারি অরূপ শব্দ নিয়ে এসেছিলাম। মুঠো আলগা করতেই পৃথিবীর অর্থহীন কলতানের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পড়তে সে শব্দ আকার নিলো। একটা মন্দ্র সংহত ধ্বনিতে উচ্চারিত হতে থাকল "মধুবাতা ঋতিয়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধব" – "বাতাসসমূহ মধু ক্ষরণ করুন, নদীসমূহ মধু ক্ষরণ করুন"। ওম মধু ওম মধু ওম মধু।

[বাক্ দেবীর প্রতি আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি]

স্বর্ভানু সান্যালের জন্ম হাওড়ার রামরাজাতলায়। ছাত্রজীবন কেটেছে পুরুলিয়া,হাওড়া ও দূর্গাপুরে। চাকরিসূত্রে কখনো মুম্বাই, হায়দ্রাবাদ, কখনো বা সূর্যোদয়ের দেশ জাপান। নয় নয় করে শেষ নয় বছর ধরে আমেরিকার শিকাগোয় কর্মরত। পেশাদারি এবং পারিবারিক জীবন বাদ দিলে, তার অনেকটা সময় কাটে সাহিত্যচর্চা করে। অনুগল্প,রম্যরচনা,কবিতা, স্মৃতিকথা নিয়মিত লিখে থাকেন। "যযাতির ঝুলি"(https://jojatirjhuli.net/) নামে তার একটি জনপ্রিয় ব্যক্তিগত ব্লগ আছে। লিঙ্কড ফেসবুক পেজ (https://www.facebook.com/jojatirjhuli)। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পত্রিকায় তার লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য নর্থ আমেরিকা থেকে প্রকাশিত পরবাস, সমাজ সংবাদ, পরিযায়ী, দেশপ্রসঙ্গ, প্রবাহ ও অস্টেলিয়া থেকে প্রকাশিত বাতায়ন পত্রিকা। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন পত্রিকায় সময়বিশেষে তার লেখা বেরিয়েছে।

অচিন দেশের রূপকথা

উৎপল রায়চৌধুরী

সে অনেকদিন আগেকার কথা। অনেক দূরের এক অচিন দেশের গল্প। সে দেশের রাজা খুবই ধীর স্থির, শান্ত শিষ্ট, বিচক্ষণ ব্যাক্তি। ভেবে চিন্তে প্রতিটি কাজ করেন। মনের ভেতর সব সময়ই থাকে কেমন করে প্রজাদের ভাল করতে পারেন। প্রজারা থাকে সুখে দুঃখে। কিছু লোক ত ধনী। যেই রাজা থাক না, তারা মোটের ওপর সব সময়ই খুব ভাল থাকে। রাজ্যের বেশীর ভাগ লোকই অবশ্য মোটামুটি করে খায়। তবে তারাও এই রাজার রাজত্বে সুখেই থাকে। দুঃখী লোক কিছু তো থাকবেই সব সময়। তবে তারা জানে যে রাজা ভাবেন তাদের জন্যে। সুযোগ পেলেই চেষ্টা করেন তাদের সমস্যা গুলো সমাধান করবার জন্যে কোনোও ভাবে সাহায্য করবার। অসুবিধে হয় সেই লোকগুলোর যারা নিয়মকানুনের বেড়াজালের তোয়াক্কা করতে চায় না, আইনের ফাঁক ফোঁকর বের করে নিজেদের পকেট ভরবার তালে থাকে।

যাই হোক, ভালোই চলছিল দিনগুলো সারা রাজ্য জুড়ে। প্রজারা ছিল সুখে স্বচ্ছন্দে। রাজার কিন্তু সুখে থাকবার জো নেই। রাজকার্যে সব সময়েই হাজার রকমের চিন্তা ভাবনা থাকে। রাজার ঘন কালো চুলে আস্তে আস্তে পাক ধরা শুরু হয়ে গেল। কিন্তু রাজকার্য বলে কথা। ওখানে তো আর ফাঁকি দেবার প্রশ্নই ওঠে না। তাই রাজা একদিন রাণীকে ডেকে বললেন একান্তে, ‘শোনো, অনেক তো হোলো, আমি ভাবছি এবার রাজকার্যে ইতি টানবো। সারাক্ষণ আর তাহলে কি ভাবে প্রজাদের ভাল হয়, সে চিন্তা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে না। মন্ত্রীরা, অমাত্যরা আর অন্য সব সরকারী লোকজন সব সময় চারদিকে ঘিরে থাকবে না। আমরা দুজনে তাহলে শান্তিতে যা আমাদের মন থেকে সত্যিই ভালো লাগে, তাই করতে পারবো। তোমার কি মনে হয়?’ মহারাণী আর কি বলবেন। বললেন, ‘তুমি তো সব সময়ই খুব ভেবে চিন্তে কাজ করো। তাই তুমি যা ভালো বুঝবে, তাই হবে। আমার পুরো সম্মতি থাকল তোমার প্রচেষ্টায়’।

দিন যাচ্ছিলো এই ভাবে। হঠাৎ একদিন ভোরবেলা জগঝম্প বেজে উঠলো মস্ত জোরে জোরে। প্রজারা সবাই অবাক হয়ে ভাবল, কি ব্যাপার? বোঝা গেল খানিক পরে। রাজা নাকি অবসর নিয়েছেন আর রাজত্বে এখন থেকে এক নূতন রাজার দিন শুরু হচ্ছে। সবাই গালে হাত দিয়ে বসে ভাবতে লাগল, এ আবার কেমনতরো রাজা হবে বা?

সময় যায় গড়িয়ে এক দিন, এক দিন করে। নূতন রাজার মতিগতি বোঝা ভার। প্রজাদের কথা না হয় বাদই দেয়া গেল, রাজার নিজের মন্ত্রীরাই হিমসিম, নাজেহাল। রাজা সকালে যা বলেন, বিকেলে যে তার ঠিক উল্টোটি বলবেন না, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। মন্ত্রীরা এক পা এগোবেন না এক পা পেছোবেন, তাই ভাবতেই দিন কাবার। তবে কেউ আর টুঁ শব্দটি করে না। রাজা ডানদিকে মাথা হেলালে পারিষদরাও ডানদিকে মাথা হেলায়, রাজা বাঁ দিকে মাথা দোলালে অন্য সবাইও তাই করতে থাকে।

চলছে এভাবে দিনগুলো। ধনী লোকরা ত সবসময়ই ভালো থাকে। এ রাজার রাজত্বেও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। সাধারণ লোকগুলো মুখ বুজে দিন গুজরান করে যাচ্ছে। নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত আছে সবাই একরকম। তবে পোয়াবারো হয়েছে সেই লোকগুলোর যাদের ঘটে বুদ্ধি আছে আর আইনের ফাঁক ফোঁকর বের করতে যারা সিদ্ধহস্ত। তারা রোজই বের করছে লুটেপুটে খাবার নূতন সব মওকা ফন্দি ফিকির করে। আর দুঃখী লোকগুলো…। নূতন রাজা ওদের কথা ভেবে ভেবেই নূতন এক ফরমান জারি করলেন – আজ থেকে সব দুঃখী লোকদেরই ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে সমস্বরে গান গাইতে হবে ‘আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে’। এ ছাড়াও দুপুরবেলায় একবার আর রাতে একবার এ গান গাইতে হবে সমস্বরে। তা হলেই আর রাজ্যে কোনোও দুঃখী লোক থাকবে না।

নূতন রাজার আদেশ। কেউ তো আর না মেনে থাকতে পারে না। মাঝে মাঝেই রাজা খবর নেন, ‘আমার রাজ্যে তো আর দুঃখী মানুষ কেউ নেই?’ মন্ত্রী থেকে শুরু করে সব পারিষদরা সমস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে, ‘না মহারাজ, আপনার রাজ্যে আর দুঃখী মানুষ কেউ নেই। সবাই এখন রাজা আপনার রাজত্বে। রাজা হয়ে যাবার পর সব দুঃখী মানুষ আনন্দে ডুবু ডুবু।’ রাজা সেটা শুনে অতি বিজ্ঞের হাসি হেসে বলেন, ‘আমি তো সেটা জানতামই। আমার নির্দেশ সব সময় মেনে চললে দুঃখী মানুষগুলোর সুখের আর সীমা থাকবে না।’ মন্ত্রীরা তা শুনে মাথা দোলাতে থাকে সমবেত ভাবে।

দিন যাচ্ছে এভাবে নূতন রাজার রাজত্বে। কিন্তু সব সময়ই তো কিছু ভাবুক লোক থাকে উল্টোপাল্টা ভাববার জন্যে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ মাঠের মধ্যে ঘাসের বিছানায় শুয়ে নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভাবে, ‘কি হচ্ছে ব্যাপারখানা? দুঃখী লোকগুলো সবাই মিলে গান তো গাইছে ঠিকই, কিন্তু পেটে ভাত পাচ্ছে কি না, জ্বরজারি হলে বদ্যির কাছে যেতে পারছে কি না, সে সব ব্যাপার নিয়ে কেউ কি কিছু করছে বা ভাবছে?’ এসব অপ্রয়োজনীয় এবং অপ্রাসঙ্গিক কথা ভাবতে ভাবতে ভাবুক লোকেদের মাথাগুলো অকারণেই যেন একটু গরম হয়ে ওঠে।

ওমা, কোথা থেকে একটা কোকিল এসে হাজির হয়। বলে, ‘এইতো মাথা গরম করে ফেলছো অকারণে। আমায় দেখনা, কেমন মিষ্টি করে গাইছি, আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে। তোমরাও তাই করো, কোনও চিন্তা থাকবে না আর।’ ভাবুকও একটু দোনামনায় পড়লো যেন। কি হবে আর ওসব উল্টোপাল্টা চিন্তা ভাবনা করে। তার চাইতে গলাটা একটু ঝেড়ে নিয়ে রাজার গানটা রেওয়াজ করাটাই বোধহয় ভাল হবে। শুরু করতে যাচ্ছিল গান, এমন সময় একটা চাঁচাছোলা হাড়গিলে কোথা থেকে এসে উদয় হোলো আর এসেই দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বললে, ‘এই ভাবুক লোকগুলো হচ্ছে যত নষ্টের গোড়া। উল্টোপাল্টা তো ভাববেই, আবার লোকজনের সামনে বলেও না বসে। আর এত, এত দুঃখী লোক যে এই নূতন রাজার রাজত্বে রাজা হয়ে সুখে আছে, তার খেয়াল রাখে কজনে। আমার দিতে ইচ্ছে হয় ভাবুক লোকগুলোর পিঠে গুম গুম করে কটা কিল। তাহলেই মাথা গরম, পেট গরম সব ঠিক হয়ে যাবে’, বলেই হাড়গিলেটা হুশ করে উড়ে গেল।

সারা রাজ্য জুড়ে গান হতে থাকলো সমস্বরে, ‘আমরা সবাই রাজা……।’ নূতন রাজা তা শুনে গোঁফ চুমরে তাঁর মন্ত্রীদের বললেন, ‘দেখেছ, এই কদিনে দেশটার পুরো খোল নলচে বদলে দিয়েছি। আমার রাজ্যে আর কোনও দুঃখী লোক নেই। আগের রাজা কোনও কম্মের ছিল না। খালি ভেবে ভেবেই সারা হতো, কাজের বেলায় ছিল লবডঙ্কা।’ অমাত্যরা সব সমস্বরে বলে উঠলো, ‘প্রভু, যা বলেছেন। আপনার মতো বিচক্ষণ, কর্মযোগী মহারাজা এ রাজ্যে কস্মিনকালেও হয় নি, ভবিষ্যতে কোনও দিন আর হবেও না।’

উৎপল রায়চৌধুরী পড়াশুনা করেছেন ভারতবর্ষে। কর্মজীবন কাটিয়েছেন আমেরিকায়। বর্তমানে অবসর নিয়ে কমিউনিটির কাজ, দেশ ভ্রমন , ও অবসর জীবন উপভোগ করছেন ।

গ্রীষ্মের সেই রাত্রি

ভাস্বতী বিশ্বাস

গ্রীষ্মকাল শান্তিনিকেতনে। সালটা বোধহয় ১৯৮৮। রাঢ়ভূমি দারুণ গরমের দাবানলে বিধ্বস্ত। সেই সময় আমরা কলকাতা থেকে সপরিবারে গেলাম, কয়েকদিনের জন্য। উদ্দেশ্য বেড়ানো নয়, আমার অসুস্থ পিতৃদেবকে দেখতে। তিনি দুর্গাপুরের চাকরি জীবন থেকে অবসর নিয়ে শান্তিনিকেতনে বসবাস করছেন তখন। যেদিন পৌঁছালাম, দুপুরে হাল্কা বৃষ্টি হওয়ায় সন্ধ্যার আবহাওয়াটা ভারি মনোরম হয়ে গেল।

বাবার মুখে কি প্রশান্তির হাসি সবাইকে দেখে, বিশেষ করে নাতিসাহেবকে পেয়ে। অপরাহ্নে রৌদ্রের ছায়া বারান্দা এসে পরেছে। করুনাদা ফুলগাছে জল দেওয়ায় গাছগুলো সজীব হয়ে উঠেছে। আর একটু পরে সূর্য অস্ত গেলে, বাবার বন্ধু অজয়কাকু তার নিয়ম মাফিক ভ্রমণ সেরে, এলেন বাবার কাছে বৈকালিক চা খেতে। ইনি বাবার নিত্য লুডো খেলার সাথী। আজকে নাতিকে খেলায় সামিল করবে বলে আদরের ডাক দিলেন, “কোথায় গেলে দাদুভাই?” ব্যাস্ খেলাতে তিনজনে মেতে গেল। বাড়িতে একরাশ আনন্দের হাওয়া। বাগানে বসলাম সন্ধ্যায়, ছোট বোন নীলাও যোগ দিল আড্ডায়। শীতল বাতাসে জ্যৈষ্ঠের তাপটা পড়ন্ত। বেলি আর জুঁই ফুলের সুগন্ধে বাগানটা মাতোয়ারা। নীলা তখন বিশ্বভারতীর বোটানির ছাত্রী। গানে তর্কে বিতর্কে সময়টা দিব্যি কাটছিলো। সবার সমাগমে হঠাৎ সুযোগ খুঁজে নীলা তার বহুদিনের অন্তরের বাসনা প্রকাশ করল মাকে, “মা চলো আজ রাতে আমরা ছাদে শুই। দিদিভাই বরুনদারা এসেছে, খুব মজা হবে।” বোনের আত্মহারা প্রস্তাব, মা শুনেই খারিজ করে দিল। কিন্তু শান্তিনিকেতনে, গ্রীষ্মের রাতে, বাইরে ছাদে শোওয়ার খুব রেওয়াজ ছিল। নীলার প্রস্তাবটি কিছু আজগুবি নয়, আমিও মনে মনে লুফে নিয়েছিলাম কেন না কলকাতা শহরে আমার ফ্ল্যাটে এর সুযোগ নেই। কিন্তু মায়ের কোনোদিন সাহস হয়নি, রাতের অন্ধকারে অজানা পরিবেশে নিশিযাপন করা। বাড়িতে পুরুষ বলতে একমাত্র বাবা, তিনি তখন বেশ অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী। আমাদের দুই বোনের অনেক অনুনয় বিনয়ের পর শেষে রাজী হলেন মা, কিন্তু ছাদে নয়, বাড়ির দালানে। হয়তো জামাই বরুণ- বাড়িতে আরেকজন পুরুষ থাকায়, সেদিন একটু স্বস্তি পেয়েছিলেন মা।

দালানটা মস্ত বড় ছিল, লাল বাঁধানো মেঝে, মধ্যেখানে মার্বেল এর অপূর্ব ফুলের নকশা। বাবা যে ঘরে শুতেন, দালানটা ঠিক তার লাগোয়া ছিল। অজয়কাকু ইতিমধ্যে চা খেয়ে লুডো খেলা আজকের মতো সমাপ্তি করে বাড়ি ফিরে গেছেন।

স্থির হলো মা, নীলা আর আমি দালানে শোবো। ঘরে বড় পালংকে শোওয়ার ব্যবস্থা হোল আমার কর্তার আর আমার পাঁচ বছরের পুত্র তাতাইয়ের। রাতের খাওয়ার পর তল্পিতল্পা নিয়ে দালানে, শোবার আয়োজন, তোড়জোড় চলল। চলে এলো মাদুর, বালিশ, তোষক, চাদর। মশারি টাঙানোর ব্যবস্থা হলো। আমাদের পোষা কুকুর জুনোকে নীলা বেঁধে রাখল মাথার কাছে পাহারাদার হিসাবে।

খোলা আকাশের নীচে, শোওয়ার অনুভূতিটাই আলাদা। মেঘের ফাঁক দিয়ে আকাশের চাঁদের আলোতে বিছানাটা ধুয়ে যাচ্ছে। নিঝুম রাত। দুরে তাল গাছের সারি কালো থামের মতো থমকে রয়েছে। সোঁ সোঁ আওয়াজ বুড়ো নিমগাছের ডালের। গ্রীষ্মের ফুলে চতুর্দিক সুবাসিত। দালানে শুয়ে কি অদ্ভুত শিহরণ আমাদের, বিশেষ করে নীলার। শখ আর আবদারটা তো সবচেয়ে বেশী ওরই। হাসি গল্পেতে ধীরে ধীরে একটু তন্দ্রা আসছিল। আকাশের তারা দেখতে দেখতে, দখিনের মৃদু হাওয়ার পরশে এক সময় আমরা সবাই ঘুমিয়ে পড়লা রাত তখন অনেকটা গভীর। নিস্তব্ধতা চারিদিকে। হঠাৎ জুনো চিৎকার দিয়ে উঠল, সে আর থামে না। সতর্ক করছে সবাইকে। ওর চিৎকারে ঘুমটা হাল্কা হয়ে গেলে, মনে হলো কে যেন আমার গলায় থাবা বসালো। নিদ্রায় উপলব্ধি না করতে পেরে, পাশ ঘুরে শুয়ে পড়লাম। পর মুহূর্তে আবার সেই থাবা!! এবার নিদ্রা ভগ্ন, চক্ষু নিমীলিত করেই দেখি একটি কালো পুরুষালি হাত, আমার গলার সোনার চেন হাতড়াতে ব্যস্ত। বুঝতে বাকি রইল না, কেন জুনো এভাবে চিৎকার করছে। সাথে সাথে আধোঘুম চোখে কালো হাতটাকে সজোরে ধরে, এক ঝটকায় মশারির বাইরে বের করে দিলাম। ঘাড় ঘুরিয়ে উঠে বসতেই দেখি মশারির বাইরে একটা আবছা অবয়ব। সেই নিশুতি রাতে মুহূর্তের জন্য হৃৎ স্পন্দন স্তব্ধ হয়ে গেল। ধুপ্ ধাপ করে দালান থেকে কিসের পড়ে যাওয়ার শব্দ। তখনো মা আর নীলা ঘুমে আচ্ছন্ন। একটা কালো ছায়া দালানের পাশ থেকে দৌড়াচ্ছে। বুঝলাম চোর, লাফিয়েছে দালান থেকে মাটিতে, প্রাণের তাগিদে। প্রথমে কেবল গোঙানি শব্দ আমার, কিন্তু যতই গলা ভর দিয়ে পরিত্রাহি চিৎকার করতে যাই, শুধু বেরোয় ক্ষীণ স্বরে চো…… চো…র আওয়াজ। জানি না কে বেশী ভয়ে কাতর-আমি না চোর। ততক্ষণে সবাই জেগে গেছে। মা ধড়মরিয়ে উঠে, কিছু বুঝতে না পেরে, জুনো কে থামানোর চেষ্টা করছে। বরুণ উঠে দালানে বেরোতে গিয়ে দেখে দরজা বাইরে থেকে আটকানো।

রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের আলো বাগানে এসে পড়ায়, সেই কালো ছায়া এখন স্পষ্ট। গাটা ছম্ ছম্ করে উঠল। তেল চকচকে দেহ, শ্যাম বর্ণ যুবকের পরনে, কেবল একটা সাদা হাফ প্যান্ট, বড় টগর গাছের দিকে পলায়মান। এরপর সবার সাহসে, বীরদর্পে চোর চোর রব তুললাম। দেখি আমাদের আউটহাউস থেকে মালী করুনাদা, হাতে লাঠি নিয়ে হুঙ্কার দিল “কোথায়? কোথায় দিদি, চোর?” । পিছনে টর্চ হাতে সন্তর্পণে তার স্ত্রী রেণুকা। দুজনে চোরকে পরাস্ত করার জন্য বাগানের দিকে ধাবমান। নীলা ইতি মধ্যে দালানের দরজা খোলার ব্যবস্থা করায়, বরুণ ও বাইরে।সেকি হুলুসথুলুস কাণ্ড! চোরকে ধরে উত্তম মধ্যম দেওয়ার জন্য সবাই উদগ্রীব। আমাদের বাড়ির শোরগোলে পাড়া প্রতিবেশী অনেকে জেগে গেছে। কি কাণ্ড! পাশের বাড়ির ছাদ থেকে সেলিমদা জোর গলায় মা কে হাঁক পাড়লেন, “কোনদিকে গেল, ব্যাটা!! মাসিমা, আপনারা ঠিক আছেন তো?” সেলিমদারাও সেদিন রাতে ছাদেই শুয়েছিল।তিনি ও নেমে এলেন, আমাদের বাড়ির দিকে।একমাত্র তাতাই আর পিতৃদেব ঘুমে অচৈতন্য। কিন্তু যাকে নিয়ে হৈচৈ, চোর তো উর্ধ্বশ্বাসে বাগানের রাস্তার দিয়ে ছুটে গভীর অন্ধকারে মিলিয়ে গেল, সবাই ছুটল সেদিকে। মেয়েরা সব তখন আতংকে ঘরের ভেতরে। নাহ্!! তাকে আর ধরা গেল না। আধ ঘণ্টার যে শ্বাস রুদ্ধ নাটক চলছিল তার যবনিকাপাত হলো। চোর যে কিছু চুরি করতে পারেনি, তাতেই সবাই আশ্বস্ত আর নিশ্চিন্ত হলো।ভাগ্যিস জুনো চিৎকার করেছিল, না হলে সোনার হারটি খোয়াতাম সেদিন। মা যা আশংকা করছিলেন, শেষে তাই হলো। নীলা অপরাধী মুখে দালান থেকে বিছানাপত্র গুটিয়ে, জুনো কে নিয়ে ঘরে ঢুকে গেল। আর সাঙ্গ হলো সেবার গ্রীষ্মে, আমাদের বাইরে নিশিযাপন।

ভাস্বতী বিশ্বাস যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী, এবং আপ-স্টেট নিউইয়র্কের দীর্ঘদিনের বাসিন্দা। তিনি তাঁর সত্য অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে এই গল্পটি লিখেছেন, শুধুমাত্র প্রকৃত চরিত্রগুলি পরিবর্তিত হয়েছে।

আজ দশমী

বন্দনা মিত্র

আজ দশমী, উমার শ্বশুরঘরে ফেরার দিন। মেনকা কাল সারা রাত জেগে পিঠে পুলি পায়েস বানিয়েছেন, আহা উমাটা বড় ভালবাসে। অক্ষম ছেলের হাতে নিরুপায় হয়ে মেয়েকে তুলে দেওয়ার দুঃখ মা ছাড়া আর কে বুঝবে, ঠিক বয়সে পাত্রস্থ করতে না পারার জ্বালা, আপনস্বজনের বিঁধিয়ে কথা শোনার অপমান, পর প্রতিবেশীর কটু বাক্য, তখন মেয়েকে মনে হয় জন্মের শত্রু, আঁতুড়ে নুন দিয়ে মেরে ফেললে ভাল ছিল। কোন রকমে ঘাড় থেকে নামলে বাঁচি। কাজেই দোজবরে বিয়ে, নেশা ভাঙ করেন ঠাকুর, রোজগারপাতি কিছু নেই, ভিক্ষে সিক্ষে করে চলাচলটি। তার ওপর চার চারটি সন্তান, ঠাকুরের সে গুণে ঘাট নেই। উমার মুখের দিকে তাকাতে পারেন না মেনকা। সাধ হয় মেয়েটাকে এনে রাখি কিছুদিন, আদর যত্ন করি, ওমা জামাই জাতে মাতাল তালে ঠিক। মান অপমান জ্ঞান টনটনে। বছরে একবার চার দিনের জন্য ছুটি মেলে , ছেলে মেয়ে নিয়ে মার কাছে আসে মেয়ে, সারা বছরের জমা কথা মায়েতে মেয়েতে বলাবলি হয়, কখনও মা কাঁদে কখনও মেয়ে। কখনও মেয়ে খুশি ঝলমল কখনও মায়ের মুখে আলো আলো হাসি। লোকে বলে উমা নাকি খুব কাজের হয়েছে, জগদ্ধাত্রীর মত , দশভুজার মত সংসারের দশদিক আগলে রাখে, কিন্তু ঘুমন্ত মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে কিছুই বুঝতে পারেন না মেনকা, ঐ তো উমা, সেই ছোটবেলার মত বাঁ কাতে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে, ঝুরো চুল সেই আগের মতই ছোট্ট কপালে এসে পড়েছে, আহা মেয়েটা স্বপ্ন দেখে কাঁদছিল বুঝি, গালের ওপর জলের দাগ। ছোট বেলায় একটু শাসন করলেই আহ্লাদী মেয়ে অমন করে রাতের বেলা বালিশ ভিজিয়ে কাঁদত।

নবমীর চাঁদ হালকা হয়ে ফুটে আছে আকাশে, দশমীর সূর্য ওঠে নি এখনও, আর কতক্ষণই বা। আবার তো এক বছরের জন্য চোখ বিছিয়ে রাখা। আবার আসছে শরতকালে কাশফুল ঝাঁকরা সাদা হলেই, উঠোনে শিউলির গন্ধ ম ম করলেই গিরিরাজকে আর্জি জানাতে হবে, আমার উমাকে এনে দাও। স্বামী তার মানুষটা খারাপ নয় , তবে বড় আলাভোলা, ঠেলা না দিলে চলেন না। রাতে যখন স্বামী অঘোরে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যান, মেনকা যেন দেখতে পান উমা তার কষ্টের সংসারে ভিক্ষে পাওয়া চাল ডাল আনাজ পাতি এটা ওটা জড়ো করে রাঁধতে রাঁধতে চোখে ধুঁয়ো দিয়ে কাঁদছে। বুকটা ছাঁৎ করে ওঠে, অন্ন রোচে না মুখে। ভোরে উঠেই স্বামীকে দিব্যি দেন উমার মুখ না দেখে জলস্পর্শ করবেন না।

এবারে যখন মেয়ে এসে দাঁড়ালো, চোখ ফেরাতে পারেন নি মেনকা, আহা কি সুন্দর ফুটফুটে হয়েছে সে দিনের সেই ছোট্ট উমা। সত্যি যেন রাজরাজেশ্বরী, জগজ্জননী । দুই মেয়ে, মায়ের মুখ কেটে বসানো, শূরবীর দুই ছেলে। আভরণহীনা উমার সর্বাঙ্গে যেন ঝলমল আলো ঠিকরে পড়ছে, মেনকা মেয়ের জন্য যে ছাইপাঁশ চুড়িটা , হারটা গড়িয়ে রেখেছিলেন তা কেমন মিটমিট ঠেকছে সেই ভুবনমোহিনী রূপের পাশে। অথচ উমা আর সকলের মতই ছিল পাঁচপেঁচি মেয়ে, রঙটা একটু কটা বলে নাম ছিল গৌরী, তবে সে তেমন কিছু না। চোখে মুখে এই ধিকিধিকি তেজই বা কোথা থেকে এল, মনে হয় যেন কপালে আঁকা এক তৃতীয় নয়ন – জ্যোতি বেরোয়। পলকহারা ঘুমন্ত মেয়েকে দেখতে দেখতে এসব কথা মনে হয় মেনকার। জগতের কি যে নিয়ম, মায়ের শরীর ছিঁড়ে যে ভ্রূণ জন্ম নেয় , মায়ের তিল তিল যত্নে আস্তে আস্তে একটা অবয়ব গড়ে ওঠে , সেই নিজের হাতে গড়া জিনিসই কিছু কাল পরে যেন অচেনা মনে হয়, অপরিচিত মনে হয়। সব সময় সুরে সুর মেলে না, তাল সমে এসে পড়ে না। একবার বাঁধন খুলে দিগ্বিদিক ছড়িয়ে পড়লে ঝর্ণা আর আপন করে টানতে পারে না নদীকে।

যাত্রার লগ্ন এসে গেল। নিজের হাতে উমাকে সাজাতে বসেছেন মেনকা রানী, অশ্রুর ভারে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে দৃষ্টি বারবার, হাত কেঁপে যাচ্ছে। কপালে অলকা তিলকার আলপনায় খুঁত থেকে গেল, কাজলের রেখা গেল বেঁকে, চন্দ্রহারের ফাঁসকল বারবার আলগা হয়ে খুলে পড়ে যাচ্ছে। কনকাঞ্জলির থালায় দুমুঠো চাল আর একটা সাদামাটা লাল পাড় শাড়ি মেয়ের হাতে তুলে দিল মা। মেয়ে চোখের জল চোখে আটকে হাতের থালা পিছনে ছুঁড়ে দেয় , ভাত কাপড়ের ঋণ শোধ হল তার ! পান পাতা, ধানভরা কুনকে, পঞ্চপ্রদীপে বিদায় আরতি করেন উমার, নিজের হাতের অঞ্জলিতে প্রদীপের তাপ সংগ্রহ করে স্পর্শ করেন মেয়ের বুকে গলায়, দুই গালে, কপালে – যেন কোন বিপদের আঁচ না আসে।

মেয়ের কানে কানে বলেন "এবারে তেমন আদর যত্ন করতে পারলুম না মা, সময় ভাল যাচ্ছে না, আসছে বছর আবার এসো কিন্তু, তখন ··· কান্নায় গলা বুঁজে যায়। মেয়ের অনিচ্ছুক মুখে সন্দেশ আর হাতে খয়ের কেয়া দিয়ে সাজা পান তুলে দিয়ে ভারী গলায় বলেন – শুধু মুখে যাত্রা করতে নেই মা , বড় হয়েছ , বোঝো না কেন ?

মেয়ে ভাঙা গলায় বলে – "মা এবার যাই তবে "

ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে মেনকার "কতবার বলেছি হৈম, যাবার সময় যাই বলে না, আসি বলতে হয়। বয়স বাড়ছে, গিন্নি বান্নি হয়েছ, এসব কথা মনে করিয়ে দিতে হয়! সংসারে কল্যাণ অকল্যাণ বোঝো না" এই উপলক্ষ্যে কান্না উথলে ওঠে, আঁচল চাপা দিয়ে দ্রুত চলে যান ঘরে, মেয়ের যাত্রার সময় মাকে থাকতে নেই শাস্ত্রে বলে।

বাঁশি বেজে ওঠে করুণ সুরে "এস মা এস মা উমা /বোলো না বোলো না যাই

মায়ের কাছে হৈমবতী ও কথা মা বলতে নাই

বারমহলে আওয়াজ ওঠে, "ওরে মা যাত্রা করছেন, বিসর্জনের বাজনা বাজা । "ঢাকে বোল ওঠে, "ঠাকুর থাকবে কতক্ষণ, ঠাকুর যাবে বিসর্জন "

কাহারদল ধ্বনি তোলে "বলো দুর্গা মাঈকি" – ত্রিভুবন কেঁপে ওঠে গর্জনে "জয়" ।

নীলকণ্ঠ পাখীর মুখে বার্তা গেছে শিবের কাছে, শিবানী গৃহে ফিরছেন, । পাগলা ভোলা কোথায় কোন শ্মশানে মশানে ভাঙ খেয়ে অচেতন পড়ে আছেন , খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ছুটে আসবেন, নিজে সন্ন্যাসী হলে কি হবে , ভুবনমোহিনী আনন্দময়ী মহামায়ার গৃহিণীপনা দেখতে বড় ভালবাসেন ঠাকুর।

দশমীর সন্ধ্যায় মেনকার হাহাকার মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে - "পুনরাগমানচ"

বন্দনা মিত্র, পেশায় মেটালার্জিকাল ইঞ্জিনিয়ার, শিবপুর বি ই কলেজে পড়াশোনা । কাজ করেন এক পাবলিক সেক্টর সংস্থায় । বিবাহিতা । লেখা, বন্দনা মিত্রের বেঁচে থাকার অক্সিজেন ।

স্মৃতিটুকু থাক

সায়ক সেনগুপ্ত

প্রিয় শ্রেয়সী,

আমি যা লিখতে চলেছি তা হয়তো তোমার কিছুটা জানা কিন্তু এতে ভণিতার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। ছোটবেলা থেকেই আমার গান বাজনার প্রতি এক নিবিড় ভালবাসা ছিল। একটু বড় হওয়ার পর তার সাথে যুক্ত হল অঙ্কন ও সাহিত্য। বড় দুর্বল করে দিত জান এর চর্চা। অভিনব একএক মূহুর্ত কেটেছে এদের সাথে। অচিরেই বুঝলাম বেঁচে থাকার এক রসদ হয়ে দাঁড়িয়েছে এরা। এরাই হল আমার তখন "Friend, Philosopher, Guide." নির্বিঘ্নেই হয়তো কেটে যেত এদের নিয়ে যদি না তোমার সাথে পরিচয় হত।

তোমাকে যখন প্রথম দেখলাম তখন এক অজানা, অচেনা নির্মম তৃষ্ণা অনুভব করলাম। মনে হল আমার সারা পৃথিবী, এতদিনের সঞ্চিত বিদ্যা যেন নিজেদের আওয়াজ হারিয়েছে। যেন তার কোনভাবে নিবৃত্তি হয়না। এরকম কেন হয়েছিল বলতে পারকি?এরকম কেন হয় আমি আজ মনে হয় একটু একটু করে হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি। মনে পড়ে সেদিনের কথা । আজ থেকে বছর দুই আগেকার হবে। সঙ্গীতের জলসায়। সপ্তরঙের এক অপরূপ বেশে আবৃত হয়ে এসেছিলে। বহুদিন পেড়িয়ে গেলেও স্মৃতি আজও পরিষ্কার। এই বেশে তোমায় দেখে এক অপার্থিব মহিমায় মোহিত হয়ে পরেছিলাম। মনে হল যেন রামধনু পরামর্শ করে আমার চোখের সামনে ধরা দিয়েছে, যেন অগুন্তি ময়ূর আকস্মিক তাদের পেখমের সাহায্যে রঙের খেলায় আমাকে ব্যতিব্যস্ত করার চেষ্টায় মেতে উঠেছে। কথা বলার মত অবস্থা সেদিন আমার ছিল না তাই এগিয়ে গিয়ে পরিচয়ের অবকাশ পাইনি।

বললাম প্রথম কথা দুই মাস পরে কফি হাউসে। সাহস করে এগিয়ে গিয়ে পরিচয় করে অবাক হয়ে দেখলাম যে তুমিও সমপরিমাণ উত্তেজিত হয়েছিলে আমার সাথে আলাপ করে। সঙ্গীতের দরুনই দেখা আর তার জন্যই একে অপরের সান্নিধ্যে বিগলিত অনুভব করতাম। ভালবাসার বোধহয় একটা রূপ আছে। অঙ্কন বিদ্যা কিছুটা রপ্ত ছিল বলেই হয়তো তা দেখতে পেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম তোমার মতন এক দির্ঘাঙ্গী, গৌরবর্ণ, ঠোঁটের কোনে যার সর্বদা এক অমলিন মধুর হাসি, কোমল হাত, অসামান্য গঠন যদি ভিন্চি মহাশয় দেখতে পেতেন তাহলে আনন্দে আত্মহারা হতেন। অঙ্কন জগত পেত এক রত্ন। বছরের পর বছর তার কদর priceless হত। কিন্তু সৌজন্য বোধ, চেতনা, ব্যবহার কি ধরা যায় শুধু ছবিতে ! বোধহয় না। আনতেই হয় কাব্য, গদ্য। লিখতে না পারলেও কদর বুঝতাম। কত কবিতা পড়তাম প্রেম নিবেদনের ভাষা খুঁজতে। পাইনি। ভাষা হারালেও গান হারায়নি।

চিরন্তন সাথি হল গান। তাই তোমার সামনে আমি গান গাইতাম। দেখতাম তোমার উজ্জ্বল মুখশ্রী ছুঁয়ে আমার গান তোমার কানের দুলকে যেন ঝনঝনিয়ে তোলে। খুশিতে ভরে উঠতো আমার হৃদয়। এত গভীর হাসি তোমার মুখে আমি দেখেছি আমার গান শুনে যা অমৃতের ন্যয়ে আমার মনকে দোলা দিয়ে গেছে। আমি বড়ই মোহবদ্ধ হয়ে পড়েছি। যেন নৌকাতে উঠে পরেছি কিন্তু বৈঠা আনা হয়েনি। নদীর গতিই আমার গতি, নদীর পথই আমার পথ। নদীই আমি, আমিই নদী। মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

কিন্তু এই অসামান্য মধুর সময়েরও অবসান অনিবার্য ছিল পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষার খাতিরে। তবে আমার আপসোস নেই কারণ আমি যথেষ্ট সময় তোমার সঙ্গে কাটিয়েছি যা আমার কাছে এক দুর্লভ রত্নের সমতুল্য। অনতিবিলম্বেই বুঝেছিলাম যে আমার স্নেহ, ভালবাসাকে তুমি বন্ধুত্বের গণ্ডির বাইরে অন্য কোন তক্‌মা লাগাতে পারোনি। অন্য নামকরণ করতে সক্ষম হতে পারোনি এই সম্পর্কের। তাই আজ হার স্বীকার করে এই চিঠি।

আমার জীবনে তোমার সাক্ষাৎ আমার এক গর্বের বিষয়, এক কাব্যিক মূহুর্ত। সারাজীবন এমনই থেক শান্ত, স্বচ্ছ তোমার দুর্গাপ্রতিমার সমতুল্য রূপ নিয়ে। কাল যেন তার মলিন ছাপ তোমাকে না দেয়। ভাল থেক।

ইতি তোমার এক তুচ্ছ অনুরাগী।

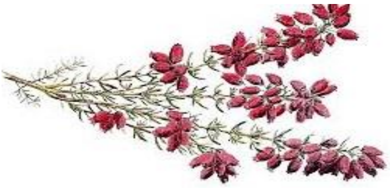

সায়ক সেনগুপ্তর জন্ম কোলকাতা শহরে ১৯৯১ সালে। সায়ক বর্তমানে বিংহাম্টন ইউনিভার্সিটিতে পি এইচডি র ছাত্র।

ভুল

অনন্যা দাশ

চার্মিকে আমাদের কলেজে কেউ পছন্দ করে না। জামাইকার মেয়ে সে। পোশাকআশাক অত্যন্ত খোলামেলা, সত্যি বলতে কি ওই ধরনের জামাকাপড় সারা কলেজে আর কাউকে পরতে দেখা যায় না। মার্কিন মুলুকের কলেজ হলে কি হবে, এখানকার ব্যাপারস্যাপার বেশ সেকেলে! পড়াশোনা করতে যারা আসছে তারা ছোট মিনিস্কার্ট আর বুক দেখানো ব্লাউজ পরে ঘুরবে সেটা মোটেই ভাল চোখে দেখে না কেউ। চার্মির ওই রকম সাজগোজের বহর দেখে অনেকেই ওর নামে কুৎসা রটায়। করিডোরে ওর নামে ফিসফাস চলে। ওর বসের কাছে প্রায় রোজ নালিশ আসে চার্মির নামে। ওনার ল্যাবে পার্ট-টাইম কাজ করে কিছু টাকা পাচ্ছিল সে, কিন্তু প্রবল নালিশের চোটে সেই চাকরিটাও গেল। পড়াশোনা তখনও শেষ হয়নি তার আগেই চাকরি যাওয়া মানে সমূহ বিপদ। চার্মির কিন্তু কিছুই আসে যায় না। শীত নেই গ্রীষ্ম নেই সে ঠিক হাজির তার উদ্ভট সাজগোজ করে ক্লাস করতে। সবাই বলে দুনিয়ার সব চেয়ে আদিম পেশা দিয়েই চার্মির খরচ চলছে। আমি নিজে ব্যক্তিগত ভাবে চার্মিকে দুচক্ষে দেখতে পারি না। ওর নামে করিডরে যখন ফিসফাস হয় তখন আমি পুরো মাত্রায় যোগ দিই! তার কারণটা খুব স্বাভাবিক, সে সুযোগ পেলেই বিজয়ের সাথে ফ্লার্ট করে! বিজয় আমার বয় ফ্রেন্ড, আমরা দুজনে একসাথে ভারত থেকে এখানে এসেছি পড়তে। বিজয়কে ব্যাপারটা নিয়ে কিছু বললেই সে হাসে, "তুমি অযথা চিন্তা করছ প্রিয়া! চার্মির স্বভাবই ওই রকম, ও সবার সাথে ওই ভাবেই কথা বলে!"

সবাই বলে নতুন কোন ছেলে আসলেই নাকি চার্মি তার সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করে। ধাক্কাও খেয়েছে তাই নিয়ে প্রচুর। ল্যারির প্রেমে যখন সে হাবুডুবু খাচ্ছে তখন জানা গেল ল্যারি গে! পিটারকে পাওয়ার জন্যে কি না করল চার্মি কিন্তু হঠাৎ খবর পাওয়া গেল পিটার নাকি বিবাহিত। বার বার আঘাত খেয়েও হাল ছাড়ে না এমনই নাছোড়বান্দা মেয়ে চার্মি! ইদানীং বিজয়ের পিছনে লেগেছে সে। চার্মি কেন গোটা কলেজ ভাল রকম জানে যে বিজয় আর আমি এনগেজড কিন্তু তাতে যেন ওর কিছুই যায় আসে না!

তারপর একদিন সকালে স্যালি আমাকে ফোন করে জানাল সে নাকি বিজয় আর চার্মিকে একসাথে অন্তরঙ্গ ভাবে দেখেছে! রাগে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সব্জি কাটার বড় ছুড়িটা সাথে নিয়ে কলেজে গেলাম সেদিন। আমার উদ্দেশ্য ছিল চার্মিকে বেশ একটু ভয় দেখানো। আমার বয় ফ্রেন্ডের থেকে দূরে থাকো, না হলে খতম!

প্রবল বৃষ্টি পড়ছিল সেদিন বিকেলে। কলেজে পাছে কেউ দেখে ফেলে তাই ক্লাসের পর আমি গাড়ি নিয়ে চার্মির পিছু নিলাম। ওর বাড়ি গিয়েই না হয় ওকে শাসাব, কিন্তু চার্মি বাড়ি গেল না। ওই বৃষ্টির মধ্যে সে একটা বৃদ্ধাশ্রমে গিয়ে ঢুকল। ভারি বিরক্ত হলাম আমি। এখানে কি করছে সে?

আমি ভিতরে ঢুকতে রিসেপশানিস্ট মহিলা জিজ্ঞেস করলেন, "কাকে চাই?"

"চার্মি আছে?"

"হ্যাঁ, সে তো একটু আগেই এসে ঢুকল। তুমি ওর বন্ধু বুঝি? চার্মিকে যে আমরা কি বলে ধন্যবাদ দেবো ভেবে পাই না! ও যেদিন থেকে এখানে ভলেন্টিয়ার হয়ে এসেছে সেদিন থেকে এই জায়গাটার চেহারাই বদলে গেছে! মৃত্যুপথযাত্রী কতজন যে সারাদিন ধরে ওর পথ চেয়ে বসে থাকে তুমি ভাবতে পারবে না! ওদের জন্যে রান্না করে আনে, ওদের বই পড়ে, গান গেয়ে কত কি করে শোনায়! আমরা রোজ ওকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করি!" আমি স্তব্ধ হয়ে শুনলাম মহিলার কথা। চার্মির এই রূপ দেখব আমি কোনদিন আশা করিনি। মহিলা বলেই চলেছেন, "ওর সাজ পোশাক দেখে প্রথমে আমরা একটু ভড়কে গিয়েছিলাম তারপর জানালাম জামাইকানরা ওই রকমই। আমাদের এখানে আরেকজন জামাইকান মেয়ে আছে সেও ওই ধরনের জামাকাপড় পরে!"

আমি আর কিছু না বলে বেরিয়ে গিয়ে গাড়িতে উঠলাম। ছাতা নেই তাই আপাদমস্তক ভিজে গেছি। বিজয়ের মোবাইলটা হঠাৎই পাশের সীটে দেখতে পেলাম! দুপুরে খেতে যাওয়ার সময় মনে হয় গাড়িতে ভুলেছে। এতক্ষণে

হয়তো খোঁজ, খোঁজ পড়ে গেছে! কি মনে হল ফোনটা তুলে সেন্ট মেসেজগুলো দেখতে গেলাম আর তখনই চার্মিকে বিজয়ের করা এস এম এসগুলো দেখতে পেলাম আমি। দিনে রাতে হরেক সময় করা সেগুলো। চার্মি বিজয়ের পিছনে লাগেনি, বিজয় চার্মির পিছনে লেগেছে!

গাড়ির খোলা জানালা দিয়ে বৃষ্টির ছাঁট আসছে। আকাশে বিদ্যুতের ঝলকানিতে দেখতে পেলাম চার্মি এসে দাঁড়িয়েছে গাড়ির পাশে। শুকনো হাসি হেসে সে বলল, “আপাত দৃষ্টিতে যা মনে সব সময় সেটা ঠিক নাও হতে পারে!”

অনন্যা দাশ পেনসিলভেনিয়া রাজ্যের হার্শি-তে বাস করেন এবং পেন স্টেট ইউনিভার্সিটিতে কর্মরত। শ্রীমতি দাশের রচিত শিশু-কিশোরদের জন্যে গল্প এবং উপন্যাস কলকাতার প্রায় সব নামকরা পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে ।

ছোট্টগল্প

রোদ্দুর! রোদ্দুর!!

দীপঙ্কর চৌধুরী

ছোটবেলায় আমাদের ইস্কুলে ড্রয়িং টিচার ছিলেন জলধরবাবু (ওঁর নিজের ভাষায়, 'ডইং স্যর')। এই নামোল্লেখমাত্র মধ্যবয়সী যে মানুষটার ছবি মনের মধ্যে ভেসে ওঠে তার পরনে খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবী, নাদুসনুদুস, দাড়িগোঁফ কামানো সদাহাস্যময় একখানি মুখ। উনি আবার আমাদের প্রতিবেশী হতেন বলে জানতাম যে ওঁদের বাড়ির সকলেই ছিলেন বেশ কেউকেটা গোছের—উকিল, ডাক্তার ইত্যাদি, কিন্তু ছোটভাই এই জলধরের 'কিছু হয়নি' বলে তাঁর মায়ের বড্ড আক্ষেপ ছিল, যিনি আবার আমার ঠাকুমার সই হতেন। জলধরবাবু ছিলেন অকৃতদার। ও'বাড়ি-এ'বাড়ি বড় ভাবসাব ছিল আমাদের, আমার বাবা-জ্যাঠা-কাকারা ওঁদের বড়-মেজ-সেজকর্তাদের বন্ধুটন্ধু হতেন, যেমন স্যরের ভাইপো পলাশ ছিল স্কুলে আমার ক্লাসমেট।

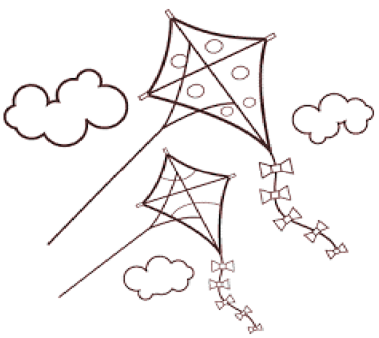

বিশ্বকর্মাপুজোর দিন ঘুড়ি ওড়ানোর ব্যাপক চল ছিল সেকালে, আর তার প্রস্তুতি চলতো মাসখানিক আগে থেকেই---টিফিনের পয়সা জমিয়ে জমিয়ে কার্তিক বোসের দোকান থেকে গুজরাটি মাঞ্জা কিনে আনা দিয়ে যার শুরুয়াৎ। তা, সেই বিকেলে পলাশদের মস্ত ছাদে সদলবল ঘুড়ি ওড়ানোর মহড়া চলছে, বিশ্বকর্মার আর তিনচারদিন দেরি আছে। কখনও ঘুড়ির ধরতাই দিতে ছাদের ঐ কোণে গেছি, দেখি আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে জলধরবাবু খিঁক্ খিঁক্ করে হাসছেন, আর আঙুল তুলে কি যেন দেখাচ্ছেন উপরের দিকে।

'হাসছেন কেন, স্যর?' শুধোই।

'ঐ দেখ্, দেখ্, মেঘের গা ফুঁউউড়ে কেমন রোদ্দুর বেরিয়ে আসছে বর্শার ফলার মতন!' খিঁক্ খিঁক্ খিঁক্ খিঁক্.....

দেখলুম তাকিয়ে। হ্যাঁ, রোদ বেরোচ্ছেই তো মেঘ ফুঁড়ে। তা, এতে এতো হাসির কি আছেটা? পরে পলাশকে এ'গল্প করতে বলেছিল, 'হ্যাঁ, ছোটকা-টা অমনই। সেদিন ঐ নিমগাছের ডালে কাগের বাসায় ডিম ফুটে ছানা বেরোতে দেখে হেসে কুটিপাটি! ঠাগ্‌মা তো তাই বলে.....'

~~~

পরের দিন থেকে আমাদের মুখ ভার, বড্ড ভার, কারণ আকাশের মুখ ভার! সে-বছর দুগ্গাপুজো বেশ আগে আগে পড়েছে, বর্ষার রেশ কাটেনি তখনও। তাহলে কি বিশ্বকর্মাপুজোর দিন ঘুড়ি ওড়াতে পারবো না? এই চিন্তাতেই ক্লাস ফাইভ-সিক্সের বালককুলের চোখে জল। বালিকাও ছিল একজন। পলাশের বোন মিনি। সে যদিও ছাদে উঠতে পায় না, কিন্তু আমাদের অনেক খেলার সাথী। বাবা ওকে এক রঙচঙে বিলিতি বই কিনে এনে দিয়েছেন, তাতে হাজারো ইন্ডোর গেমস শেখানো আছে। ওখান থেকেই মিনি আমাদের 'ডাম্ব-শরেড' খেলতে শিখিয়েছিল, আমরা সকলে খেলতুম একসাথে। তা, সেদিন ভারি বর্ষার কারণে বিকেলবেলায় আমরা ছলোছলো চোখে সকলে ঘরে বসে আছি দেখে মিনিরও

চোখে জল। মাঞ্জা ভিজে কাঈ!

এমন সময় ছপ্‌ছপ্ করতে করতে কাগভেজা হয়ে জলধর স্যরের কক্ষে প্রবেশ। যথারীতি হাসছেন মৃদু মৃদু, 'এই দ্যাকো, তোমরা সব এখেনে বসে আচো, আর ঐ দিকে.....'

আমরা পাত্তা দিলুম না, কারণ এইটি ছিল ডইং স্যরের সিগনেচার-বাক্য......ওঁর কাছে তো সবকিছুই বড্ড আশ্চর্যের, সমস্ত জীবনটাই ইভেন্টফুল।

ফট্ করে পকেট থেকে এক দেশলাইবাক্স বের করে বললেন, 'বল দিকি, কি আচে এর মধ্যে?'

সেকি? স্যর কি আজ ম্যাজিক-ট্যাজিক দেখাবেন নাকি?
~~~

মিনির চেয়ারের পাশে গিয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে বাক্সটা সামান্য খুলতে আমরা সকলেও হামলে পড়ে দেখে নিলুম যে ভিতরে নীলচে-কালচে এক পোকা নড়নড় করেছ।

'কাঁচপোকা!' মহানন্দে বলে উঠলেন জলধরবাবু, 'কোথায় পেলুম বলতে পারলি না তো?' আমাদের বলার ইচ্ছেও নেই, এমনিতেই ঘুড়ি ওড়ানো হচ্ছে না বলে মেজাজটা খিঁচড়ে আছে, এখন কি আর বাচ্চাছেলের মতো ঐ কাঁচপোকা নিয়ে খেলার সময় আছে?

'এই রে! যাঃ! দেখেছ, পুরো ভুলে মেরে দিয়েছি। ' বলে বাক্স-টাক্সো ফেলে লাফ মেরে ঘর থেকে হঠাৎ উধাও হয়ে গেলেন স্যর আর সেই কাঁচপোকাটাও মওকা পেয়ে ভোঁ করে উড়ে জানলা দিয়ে পালিয়ে গেল।

ঘটনার আকস্মিকতায় আমরা হতভম্ব!

'গেলো ঐ পিঁপড়েদের চিনি খাওয়াতে'। মুখ বেজার করে শামু বললো। পলাশের খুড়তুতো ভাই।

~~~

সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফেরা মাত্র মা-ঠাকুমা ঝাঁঝরে উঠলেন, 'কোন্ আক্কেলে তুই আজ এতো দেরি করে বাড়ি ফিরলি? আজ যে গুরুদেবের পাঠ রয়েছে সন্ধ্যেবেলা।'

এই রে! এক্কেবারে ভুলে মেরে দিয়েছি। মঠের এক গুরুদেব মাঝে মাঝে আসেন আমাদের বাড়িতে। কথামৃতপাঠ হয়। সপরিবার গদগদ ভক্তিতে শুনতে বসতে হয়। হাত-পা ধুয়ে নিয়ে সেদিনও বসলুম গিয়ে আমাদের অন্য ভাইবোনেদের সঙ্গে, বাবা-জ্যেঠারাও আছেন।

কি পাঠ করছেন অতো ঢুকছে না কানে। মন পড়ে আছে আকাশে। বৃষ্টি থামবে তো? বিশ্বকর্মার দিন ঘুড়ি ওড়াতে পারবো তো? গুরুদেব সেদিন পাঠ করছেন সারদানন্দের লীলাপ্রসঙ্গ থেকে। রমতা সাধু এক এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে। সারাদিন যা দেখেন, তা-ই তাঁর আশ্চর্য লাগে, আর হো হো করে হাসেন,..... 'অরেঃ ক্যা প্রপঞ্চ হৈ! এই দিন ছিল, আর এই রাত ঢলে এলো। কি আশ্চর্য! কি আশ্চর্য!' কিশোর গদাধর তাঁর কাছ থেকে আনন্দের পাঠ পেলেন। পরমেশ্বরের সকল স্বাভাবিক কর্মই আনন্দের, কেবল সেই আনন্দটা দেখার চোখ চাই, মন চাই।

কিছুই বুঝলুম না। সে তো আমাদের জলধরবাবু ডইং স্যরও আকাশের মেঘ আর গাছের ডালে কাগের ছানা হওয়া দেখে আনন্দে মেতে ওঠেন। তাহলে কি উনিও একজন সাধু? কে জানে বাবা। এখন কাল রোদটা উঠলে বাঁচি।

~~~

পরের দিন ছুটি ছিল, বোধহয় রোববার। সকাল দশটার মধ্যে পলাশদের ছাদে গিয়ে হাজির। রোদ না উঠলেও বৃষ্টি হচ্ছে না। এই ম্যাদ্‌ম্যাদে আবহাওয়ায় মাঞ্জা কড়া হয় কখনও, বলো? নিচে থেকে মিনি চেঁচিয়ে ডাকলো, 'টুবুদা, শীগগির নিচে নেমে এসো', আর আমরা সব দুড়্‌দুড়্ করে তিনতলার ছাদ থেকে নেমে এলুম। দেখি ডইং স্যরের সঙ্গে এক ফকিরবেশী দাড়িওয়ালা লোক দরোজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, গলায়

তাঁর এক হারমোনিয়ম ঝোলানো।

'কেন মল্লিকদা-কে ডেকে আনলুম বলতে পারবি না কেউ তোরা নিশ্চই?' চোখ ছোট ছোট করে যেন বড় গোপন কথা কিছু বলছেন এমন ভাবে বললেন স্যর। আমরা বেজার হয়ে ছাদে ফিরে যেতে যাচ্ছি, স্যর বললেন, 'অ মল্লিকদা, ধরো না তোমার সেই.....'

এখন মোটেই আমাদের গান শোনবার মুড নেই। আমাদের লিডার পলাশ সেটা বললোও, 'ছোটকা, দেখছ বৃষ্টিতে সব ঘেঁটে আছে, আর তুমি এখন গান শোনাতে চাচ্ছ।'

'ওরে, বেঁটে বক্কেশ্বর, সেই জন্যেই তো গান শুনতে হবে। দীপক রাগিনী!'

'যে রাগে আগুন জ্বলে ওঠে?' মিনির গালে হাত!

'আর বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়!' আমার কথাটার মধ্যে বেশ ঠেস্ ছিল।

‘কৈ, মা-জননী কৈ? দেখি?’ মিনির গলা শুনে সে গায়ক ‘মল্লিকদা’ দেখি ইদিক-উদিক খুঁজছেন। আরে, মেয়েটি তো সামনেই বসে আছে; উনি দেখতে পাচ্ছেন না?

আর তখনই বুঝতে পারলাম যে উনি দৃষ্টিহীন!

এবার উনি হারমোনিয়মের রীড টিপে টিপে সুর তুলতে শুরু করলেন। গাইছেন না কিন্তু তখনও, কেবল সিঙ্গল রীডের সেই হারমোনিয়মে অদ্ভুত দ্রুততায় আঙুল চালিয়ে চালিয়ে সুর তুলছেন। মা-জ্যেঠিমা-ঠাকুমারা ঘিরে এসেছেন ওঁর সুর শুনতে। অবাক অদ্ভুত বিস্ময়ে আমরা জনা পনের প্রাণী সেই অন্ধ গায়কের সুরে মন্ত্রমুগ্ধ! আমরা কেউ কোনো কথা বলছি না, শব্দ করছি না। কেবল কোথায় ভেসে গেছি, ডুবে গেছি সেই অজানা সুরে।

হঠাৎ দেখি মিনি ওর হুইলচেয়ারটা ঠেলে পিছনে সরিয়ে দিয়ে একা একাই উঠে দাঁড়িয়েছে। শুধু তাই নয়, এক এক পা এগোনোরও চেষ্টা করছে যেন, যা দেখে আমরা সকলে বাক্যহারা। জ্যেঠিমার তো প্রায় মূর্ছা যাবার উপক্রম।

কতক্ষণ ডুবে ছিলুম আমরা সেই সুরসাগরে? জানিনা।

এবার কলিম মল্লিক গেয়ে উঠলেন আগমনী গানঃ

‘কবে যাবে বলো গিরিরাজ, গৌরীরে আনিতে

ব্যাকুল হইয়েছে প্রাণ, উমারে দেখিতে হে....’

হঠাৎ আকাশের দিকে ঘাড় তুলে দেখি সেখানে ঝকঝক করছে রোদ্দুর! রোদ্দুর!!

পুজোর আর ক’দিন বাকী?

~~~

দীপঙ্কর চৌধুরী একজন শিশুসাহিত্যিক, গ্রন্থ-সমালোচক ও অনুবাদক।
প্রকাশিত কিশোরগল্প-সংকলন
'ডাইনি ও অন্যান্য গল্প' ; 'কলোনিয়াল কলকাতার ফুটবল স্বরূপের সন্ধানে' (অনুবাদ)।
'পরবাস' পত্রিকার গ্রন্থ-পরিচয়ের কলমটি লিখছেন গত দশ বছর ধরে ; ছদ্মনামে।
কলিকাতা নিবাসী। হিন্দু স্কুল ও প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তনী। পেশায় ব্যাঙ্কার।
cdpnkr@gmail.com
dip84pnb@gmail.com
M 8294636297
~~~

রুটিন

তুষ্টি ভট্টাচার্য

এভাবেই দিন কেটে যাবে। সারাদিন অফিস, রাতে ধুঁকতে ধুঁকতে বাড়ি, ছুটির দিনে বাড়ির হাজারটা প্রয়োজনে ছোটাছুটি, নিয়ম করে সপ্তাহান্তে ক্লাবে আড্ডা, আর মদ খাওয়া। বছরে একবার বেড়াতে যাওয়া, ব্যাস্‌, এই তো জীবন। এর বাইরে আর কিছু আছে? রুটিন বাঁধা, শেকল বাঁধা একটা জীবন। কেউ হয়ত বলবে, এই বা কম কীসের? এই বা কজন পায়? ভাল মন্দ খাওয়া, ঘোরা, বেড়ানো, বন্ধু, আড্ডা, মদ, সবই তো পাচ্ছ বাবা! আর কি চাই? মেয়েছেলে? সে যাও না কেন, কে বারণ করেছে? ও আচ্ছা, বুঝেছি, জানাজানি হলে প্রেস্টিজের একশেষ, তাই তো? মধ্যবিত্ত মানসিকতা ছেড়ে বেরতে পার নি কিনা! তাই অবদমন আমাদের সেতু। ইচ্ছে আর ইচ্ছেপূরণের মাঝে এই অবদমন আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠায় দুলতে থাকে, নড়েও না, চড়েও না।

মাঝেমাঝেই ছোটবেলার কথা মনে আসে। বয়স বাড়ছে বুঝতে পারি। এখনকার ছেলেমেয়েদের থেকে আমরা অনেক ভাল ছেলেবেলা পেয়েছিলাম। নাই বা পেলাম ভিডিও গেম বা মোবাইল। আমাদের খেলার মাঠ ছিল, দুরন্ত শৈশব ছিল। বন্ধু অন্ত প্রাণ ছিল। এখনকার ছেলেমেয়েদের মত যে যার সে তার নয়। এখনো ছোটবেলার বন্ধুদের কারুর সঙ্গে দেখা হলে খুশিতে মন ভরে ওঠে। আর এরা? কাজ ফুরোলেই পাজী। এই যেমন সেদিন আমি খেয়াল করি নি, পেছন থেকে নাম ধরে কে যেন ডেকে উঠল। ফিরে দেখি, অতনু। মুহূর্তের মধ্যে মন উড়ে চলে গেল আঠেরোয়। কতক্ষণ যে নিজেরা বকবক করে গেছি, খেয়াল নেই কারুর। ওর দুটো মেয়ে। ছবি দেখাল, দুজনেই বেশ বড় হয়ে গেছে। একজন ডাক্তারি পড়ছে, একজন ফ্যাশন ডিজাইনিং। আমার ছেলেটা তো পাতি পাস কোর্সে বিকম, তাও অর্ডিনারি কলেজে। মেয়েদুটোর মুখশ্রী ভাল হলেও গায়ের রঙ চাপা। এটা দেখে যেন মনের মিইয়ে আসা ভাবটা একটু কমল। আর যাই হোক, আমার ছেলেটা দেখতে সাক্ষাৎ রাজপুত্র। ওর মায়ের রঙ আর আমার গড়ন মিলিয়ে হয়েছে। তবে সুন্দর না হলেও সমস্যা ছিল না, সোনার আঙটির আবার ব্যাঁকাত্যাড়া! আর পাসকোর্সে পাস করলেও টেনশন নেই, ওর দিদার যা আছে, এক মেয়ের ঘরে একটি মাত্র নাতির জন্য হাত উপুড় করে দেবে। সেদিক থেকেও অতনুর কপাল খারাপ। ওর বউ গরীব ঘরের মেয়ে। নিজেও কেরানীগিরি করেই কাটিয়ে দিল। তাও যে কীভাবে মেয়েদুটোকে মানুষ করে ফেলল! কালো মেয়ের বিয়ে দেওয়া কিন্তু আজকের দিনেও মুশকিল! সে যাই হোক, ওর মেয়ে, ওই বুঝুক।

ঈর্ষা কি বয়স বাড়লে বাড়ে? তবে যে বলে, ছোটবেলায় বন্ধুদের মধ্যে হিংসে-হিংসি হয়। কই, তখন তো ছিল না! রাতে শুয়ে প্রথমেই জয়ন্তর এই ভাবনা মাথায় এল। লজ্জা পেল কি একটু? অনুশোচনা? নাকি আত্মসুখ? সোনালীকে আগে আরও অনেক সুন্দর দেখতে ছিল। এখন যে পাশে শুয়ে আছে, তার সাদা ফ্যাটফেটে চামড়া দেখলে মনে হচ্ছে, হিমোগ্লোবিনের অভাব। সত্যিই তো, ওকে অনেকদিন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় না। আর ও যা মেয়ে, সাত চড়েও নিজের অসুবিধের কথা মুখ ফুটে জানাবে না। মাথার চুল উঠে অনেক পাতলা হয়ে এসেছে, ঘুমন্ত মুখটায় একটা হাসি খেলা করছে ওর এখন। নিশ্চই স্বপ্ন দেখছে। ও কি এখনো ওর সেই আগের প্রেমিককে স্বপ্নে দেখে? মানুষের মনের ভেতর ঢুকে যদি দেখা যেত… তাহলে অয়নও কিন্তু জেনে যেত ওর হিংসের খবর! শিউরে উঠল ও ভেবেই। ছাদে গেল দরজা খুলে। আজ সত্যিই ওকে অনিয়মে পেয়েছে। বিছানায় শুলেই যার ঘুম আসে, তাকে আজ রাত দুপুরে ছাদে পায়চারী করতে হচ্ছে। কাল নাহয় অফিস যাবে না। ফোনে বলে দেবে জ্বর হয়েছে। আর নাই বা বলল, দাসখত লিখে দিয়েছে নাকি!

সপ্তর্ষিমন্ডল

তুষ্টি ভট্টাচার্য

যত রাত বাড়ে আমার নেশা ততই চড়ে। এই নেশার থেকে আর নিষ্কৃতি নেই। এই নেশা আমাকে ধরিয়েছিল রুমকি। ও নিয়মিত ছিল। অনেকদিন ধরেই এই নেশায় আচ্ছন্ন করে নিয়েছিল নিজেকে। মনে পড়ে সেই প্রথম দিন, যেবার দোলের দিনে রুমকি আমাদের বাড়িতেই থেকে গেল। রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখি ও বিছানায় নেই। ছাদে দাঁড়িয়ে আছে আকাশের দিকে তাকিয়ে। ওর শরীরটা অল্প অল্প দুলছে, যেন নিশি ভর করেছে ওকে, বসন্তের উদাম হাওয়ায় ওর খোলা চুল উড়ছে, সেই জ্যোৎস্না রাতে ওকে রুমকি মনে হচ্ছে না আর, মনে হচ্ছে এক পরী এসে নেবেছে ছাদে। আমি ওর পাশে গেলে আমাকে আকাশের দিকে আঙুল তুলে বলল, দেখতে পাচ্ছিস? ওই যে, ওদিকে… আমি দেখলাম এক ঝাঁক তারা ভর্তি আকাশ যেন আমাদের দেখে হেসে উঠল! সেই শুরু।

এমনিতে বর্ষাকাল আমার খুব প্রিয়। শুধু এই নেশার অভাবেই যা ছটফট করি। উইথড্রয়াল সিম্পটম। শরীরে নয়, মনে অসম্ভব খিঁচুনি ধরে, কাঁপতে থাকে আকাশটাও, আমি কাউকে চিনতে পারি না সেই সময়ে। রুমকিকে যাচ্ছেতাই গালাগাল দিই শুধু। রুমকিও এই সময়ে একই ভাবে কাঁপছে। আমি তখন ক্রতু হয়ে রুমকি নামক পুলহের সঙ্গে সরলরেখায় যুক্ত হয়ে যাই। আমরা জানি এই রেখা বরাবর চলেছে পৃথিবীর সমস্ত না-ডুবে যাওয়া জাহাজ। আর এটা শুধু আমিই জানি যে, ওই যে চির উজ্জ্বল, চির প্রশান্তির, চির ভাস্বর দীপ্তি নিয়ে সমস্ত ঋতু জুড়ে ভোরের আকাশে দাঁড়িয়ে আছে, সে আর কেউ না, আমার দিদাই।

সেদিনও ছিল বসন্ত। যখন ঋতুর সঙ্গে রাজর্ষির বিয়েটা হল। যেদিন থেকে রুমকি আরো নেশাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। রাতের পর রাত আকাশের দিকে তাকিয়ে কাটিয়ে দিয়েছে, কিন্তু ঋতু আর রাজর্ষি সেখান থেকেও ওকে জ্বালিয়েছে। রাজর্ষি অনেক চেষ্টা করেছিল ঋতুকে এড়িয়ে যাওয়ার, কিন্তু বিয়েটাও যেমন পাকেচক্রে ওদের হয়ে গেছে, তেমনি ওদের অশান্তি ভরা দাম্পত্য একদিন হঠাৎ করেই নিভে গেছে কার অ্যাক্সিডেন্টে। এরপর রাজর্ষি বশিষ্ঠ হয়ে গেলেও, পিছু ছাড়ে নি ঋতু। আবছা হলেও অরুন্ধতির মত তার অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে, অধিকার বজায় রেখে চলেছে।

পুলস্ত, অত্রি, অঙ্গিরা, মরীচিকে আমি বা রুমকি এখনো চিনে উঠতে পারি নি, ওরা আমাদের মাঝখান থেকে একেক সময়ে একেক রূপে উঠে এসে আকাশে মিশে যায়। ওরা হয়ত আমরাও! আসলে নেশার ঘোর আমাদের বিচ্ছিন্ন করে রাখে চারপাশ থেকে। শুধু রাতের অপেক্ষায় থাকি আমরা, সেও যুগ্মভাবে নয়, আমরা একা থাকতেই এসেছি, তাই সরলরৈখিক দূরত্ব বজায় রেখেই আমরা নেশা করি, যে রেখা ধরে যেদিকে এগোলে কম্পাসও পথ দেখতে পায়, আমরা সেদিকেই ফিরে বসে থাকি। আমাদের উল্টোমুখে যে সিংহ রয়েছে, সেদিকে যাওয়ার জন্য আমরা কখনওই কোন জাহজকে উসকোই নি, বিশ্বাস করুন! এমনকি সেই ভালুক বা শিকারির গল্পেও আমাদের বিশ্বাস নেই, আমরা পাশ্চাত্য দর্শন ভুলে গেছি কুড়ি বছর আগে। সেই থেকে এখনো আমাদের চোখে জ্বলে ওঠে শয়ে শয়ে, হাজারে হাজারে আলোর জ্বলজ্বলে বিন্দু, যা আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দেয় না, আচ্ছন্ন করে, মোহগ্রস্ত করে শুধু।

পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার শেওড়াফুলি নিবাসী, তুষ্টি ভট্টাচার্য গদ্য ও কবিতা দুইই লিখে থাকেন। এ পর্যন্ত দুটি কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে। পাঠক প্রকাশনী থেকে 'ভিজে যাওয়া গাছ' ও সৃষ্টিসুখ প্রকাশনী থেকে 'ব্ল্যাক ফরেস্ট'।

প্যাঁটরা

দেবতোষ ভট্টাচার্য

।। ওঁ ।।

পানিহাটি, ২৮শে বৈশাখ

স্নেহের বুঁচি,

কেমন আছিস রে? নাহ্, এবারে আর তোর ওখানে যাওয়া হয়ে উঠল না! হাতে টিকিট – অথচ চোখের সামনে দিয়ে ট্রেনটা বেরিয়ে গেল। তোর বাবার টেলিগ্রামটা নিশ্চয়ই পেয়েছিস। কিন্তু তাতে তো আর সব কথা বলা যায় না, তাই ভাবলুম চিঠিতেই খুলে বলি।

তুই তো আবার তোর বাবার কোন দোষ চোখে দেখতে পাস না – কিন্তু এই ট্রেন মিস হওয়ার জন্য ঐ একজনই দায়ী। ব্যাস, ওমনি একেবারে ফোঁস করে উঠলি তো! সারাজীবন এই প্যাকিং করা নিয়ে অশান্তি করে গেল, কিন্তু এবার জব্বলপুর যাওয়াটা নিয়ে যা হল কি বলব।

এই গেল গেল গেল! হেবোদের মেনিটা মুখে করে পার্সে মাছ নিয়ে পালাল রে! উফ্, দাঁড়া – রান্নাঘরের শেকলটা তুলে দিয়ে আসি গে। এক মিনিটও একটু বসার যো নেই!

যাক্, দুটো নিতে পেরেছে মোটে। চিঠিটা লিখেই আজ যাব ওদের বাড়ী। একটা হেস্তনেস্ত করা দরকার। হ্যাঁ যা বলছিলুম – ওরে বাড়ী আমার পুরো গুদামঘর হয়ে গেল রে! গুচ্ছের জিনিস কিনে আনছে, চেঁচামেচি করলেই বলে – আহা ত্যাঁদড়টা বড় ভালবাসে! এবার অবিশ্যি আমি বলেছি, ওই নামটা ছাড় তো! এত বড় হয়ে গেল মেয়েটা।

কি বললি? আহা এমন কি জিনিস এনেছে? বেশ, লিস্টিটা বললেই বুঝতে পারবি! "বাবাজী"র পেঁপে ফ্লেভারড্ কেক, "কটকটে"র লেড়ো বিস্কুট, "দুনম্বরী"র ভেলি গুড়, "গোমাতা"র ঘি, "কুরুক্ষেত্র"র গোবিন্দভোগ চাল, "দাবানল"এর আগুন ঝাল চানাচুর, বড়ি (ছোট, মাঝারি, বড়, মশলা, লাল, সাদা, হলুদ – সব ৩ প্যাকেট করে), পাঁচফোড়ন(৩ কিলো নিয়েছে বলে ৩০০ শুকনো লঙ্কা ফাউ), ৭ কিলো ছাতু, ১০ টা নারকোল, "মাধুরী"র কচুর পাঁপড়, খোলাসুদ্ধু বাদাম(বলল পচবে না), "পা ছড়িয়ে খান"এর মুড়ি – নাহ্ সব এখন আমার ঠিক মনেও পড়ছে না। হ্যাঁরে, এসবই ঐ মোড়ের মাথার কেলোদের "অগ্নিমূল্য স্টোর্স" থেকেই নিল। আবার যাবার দিন "খেয়েই মরব" সন্দেশ কিনে আনল ৭ প্যাকেট "সরেস" থেকে।

কি বলছিস রে গুজগুজ করে? আমিও একই রকম। এই ভরদুপুরে পায়ে পা দিয়ে মেয়ের সাথে ঝগড়া করতে আমার ভাল লাগে না, বুঝলি? তা এতদিন বাদে যাচ্ছি – টুকটাক কিছু তোর জন্যে নিয়ে যাব না? সুদোদের গাছে কচি নিমপাতা এসেছে – আহা কি রঙ তার। গিয়ে তুলে নিয়ে এলুম কয়েক কৌটো। একদম গজগজ করবি না। এইসময় নিমপাতা খাওয়া খুব ভাল রে! আর ঐ কয়েক বয়াম চিড়ের মোয়া, মুড়ির মোয়া – ও হ্যাঁ কালমেঘের বড়িও করে নিয়েছি বেশ কয়েকটা। মাঝে মাঝেই মুখে ফেলে দিবি নাহয়।

নিয়েছিলাম রে, আচারও নিয়েছিলাম! কিসের? এই ধর উচ্ছের আছে, এছাড়া লাউয়ের, ওলকচুর, পালং শাকের, জামরুলের, কুমড়োর – ও হ্যাঁ, ঝিঙেরও করে নিয়েছিলুম কয়েক বোতল। না, ঐ সব আম, লেবু, লঙ্কার আচার নিইনি – যত্ত সব ছাইপাঁশ খেয়ে শরীর খারাপ করে বস আর কি। আমারগুলোর মধ্যে প্রচুর আছে – কি সব ভিটামিন টিটামিন বল যেন তোমরা! এসবই আমি তোমার জন্য টিভিতে "ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি" অনুষ্ঠান দেখে বানিয়েছি। একা একা থাক, শরীরটার দিকে এবার একটু নজর দাও।

দাঁড়া বেশ অনেকক্ষণ ধরে লিখে চলেছি, একটু জল খেয়ে নি।

হ্যাঁ তারপর বলি। ওরে যাবার দিন দুই আগে সে করলো ফলের বাজার। কতরকম যে আম এল – কষ্টি, আধকাঁচা, কাঁচা, সিকি পাকা, পৌনে পাকা, টুসটুসে পাকা। অনেকদিন ধরে রয়েসয়ে নাকি খাওয়া যাবে। আর নামেরও যে কি বাহার – খাসগোলাপ, মেমপসন্দ, হিমদিঘী, চেন্নাই, তোতাপুলী, খুজলী, ল্যাংড়ী! আবার দক্ষিণের বেগুনপল্লী না কি যেনও রয়েছে। নামগুলো একটু উল্টোপাল্টা হয়ে যেতে পারে রে। বয়স হচ্ছে বেশ বুঝতে পারি। তাছাড়াও এসেছে বহরমপুর না বোসপুকুর কোথাকার যেন লিচু, জাম আর ডাঁসা পেয়ারা। সব নাকি ত্যাঁদড় খাবে! যাক গে, তোদের ওসব বাপ বেটির পিরীতের মাঝে আমি নাক গলাতে চাই না।

গলাইও নি বুঝলি। ঐ নাকের কথাই বলছিলুম। কিন্তু যাবার আগের দিন যখন মিনমিন করে বললে যে এই ১৩টা ব্যাগেও কুলোচ্ছে না, আরও খান চারেক লাগবে – মাথাটা গরম হয় কিনা বল! তা আমার কথা কবে কখন শুনেছিস তোরা দুজন? যাই হোক, গেলুম তেনার সঙ্গে বড় রাস্তার "তল্পিতল্পা"য়। আরে এটা তুই দেখিস নি – নতুন হয়েছে। অনেক রকম ঢাউস ব্যাগ পত্তর আছে দেখলুম। তোমার বাবার আবার পছন্দ হল গিয়ে ট্রাঙ্ক। সব নাকি সেফ থাকবে তাতে। নয় নয় করে তাই খান চারেক কেনা হল।

দাঁড়া দাঁড়া, এখনো অনেক ঘটনাই বাকি আছে বলার আমার – একটু ধৈর্য ধরো মা। জামা কাপড় গোছানোর সময় সে এক বিষম গন্ডগোল। নপাটি মোজা, কিন্তু কোনটারই জোড়া খুঁজে পাওয়া গেল না – সব একপাটি করে পাওয়া যাচ্ছে। যাই হোক আমি কিনে দেব বলাতে তখনকার মত সামলে নিল। কিন্তু পাঞ্জাবী পাজামার সঙ্গে যখন দেখলুম এই গরমেও মাঙ্কিটুপি আর খান কয়েক সোয়েটারও ঢুকছে, তখন আর মাথা ঠিক রাখতে পারলুম না। তা চিল চীৎকার করে আমায় বোঝান হল – একটু বৃষ্টি পড়লেই নাকি ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে। আর এই সব গণ্ডগোলে আমার পূর্ণিমার চাঁদের মত রুটি তাওয়ায় পুড়ে অমাবস্যার মত কালো হয়ে গেল। রাত্রে চিড়ে গুড় খেয়েই শুয়ে পড়লুম – পরদিনই ট্রেনে চেপে তোর কাছে যাচ্ছি, এই ভেবেই চুপ ছিলুম রে!

কিন্তু চুপ থাকতে দিলে তো! কে আবার, তোমার বাবা! সক্কালবেলা চান টান সেরে শাড়ী পরে বেরিয়েছি, দেখি রান্নাঘর থেকে খুটখুট আওয়াজ। আসলে কয়েকটা তলতলে আম লুকিয়ে সরিয়ে রেখেছিলুম – প্রায় পচেই গেছিল! দেখি সেগুলো কেটে টিফিন কৌটোয় ভরছে। আমার করাল বদনী মূর্তি দেখে কথা ঘোরাতে গেল। ন্যাকা ন্যাকা গলায় বলে - বাঃ শাড়ীটা বেশ, কে দিয়েছে ত্যাঁদড়? আরে ঐ যে গতবারের পুজোয় বিদ্যানিকেতন না কোথা থেকে যেন বাবার সাথেই গিয়ে কিনেছিলুম। তুই দেখেছিলি, ষষ্ঠীর দিনই তো পরেছিলুম। তা দাঁত কিড়মিড় করে বলেই ফেলেছি – না, ত্যাঁদড়ের বাবা রামত্যাঁদড়। আহা মানছি না বললেও হত ওভাবে, তোকে আর বাপের হয়ে গলা ফাটাতে হবে না! কিন্তু এদিকে তো চীৎকার করে ডাকলেও নাকি শুনতে পায় না। আর এগুলো দিব্যি শুনতে পায় তো!

বেশ খানিকক্ষণ খিটিরমিটির চলছিল, হঠাৎ ডিংডং। ঐ কোনের বাড়ীর সাতকড়ী বাবু – উঠতে বসতে তোর বাবার পরামর্শ চাই তাঁর। তা ওদের বাড়ীর টিয়াটা হঠাৎ রাধেকৃষ্ণ বলা ছেড়ে কিসব অকথা কুকথা বলছে নাকি। তোর বাবা জানতে চাইল – ও কি লঙ্কা খায়? উত্তর এল – খুব খায়। আবার জানতে চাইল – কাঁচালঙ্কা ভালবাসে? খুব ভালবাসে। তোমার বাবা ভেবে চিন্তে বললেন – রোজ একটি করে কাঁচালঙ্কা মধুতে ডুবিয়ে দিন। দিনে দুবার, পাঁচদিন।

এইসব করতে করতেই দেরী হয়ে যাচ্ছিল। মোড়ের রিক্সাস্ট্যান্ডের জগ্গুকে বলাই ছিল। সে দেখেশুনে বললে – একটা লরি বুক করলে ভাল হত বাবু, এত মাল। দাঁড়ান আরো কটা রিক্সা ডেকে আনি গে! সে বুঝলি বুঁচি, রাস্তায় সবাই হাঁ করে দেখছে - যেন বাক্সের শোভাযাত্রা চলেছে! যাই হোক কষ্টেসৃষ্টে স্টেশনে তো পৌঁছলাম। স্টেশনে নেমে দেখি, একটা জব্বলপুরের ট্রেন বেরিয়ে গেল সাঁ সাঁ করে। তা লোকজনকে জিজ্ঞেস করে জানলুম আমাদেরটাই বটে। কাঁপতে কাঁপতে তোমার বাবার দিকে তাকাতেই তিনি বাঁ হাত তুলে অভয় দিয়ে বললেন- ধুর, এটা কালকেরটা। লেট রানিং।

আমার তখন কি যে অবস্থা বুঝতেই পারছিস। শেষে কালো কোট পরা মুষকো চেকার বাবুও টিকিট ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে যখন বললেন, আমাদের ট্রেন এইমাত্র বেরিয়ে গেল - আমি যেন চোখে সর্ষেফুল দেখলুম। হ্যাঁ, ঐ হলুদই হবে – অত রঙ টঙ এখন খেয়াল নেই বাপু! মুখে চোখে একটু জল দিয়ে এসে দেখি তিনি দিব্যি কৌটো খুলে আমের আঁটি চুষছেন। আমায় দেখে সড়াৎ করে হাতটা পেছনে লুকিয়ে বলে কিনা – ট্রেন বিফোর টাইমে এলে আমি আর কি করব বল?

না ঝগড়া করিনি আর, তুই বিশ্বাস কর বুঁচি! এর সঙ্গে ঝগড়া করে কি কোন লাভ আছে বল? শুধুমুধু নিজেরই শরীর খারাপ করা। দাঁড়া, এখুনি আবার তিনি চায়ের জন্য হাঁকপাঁক শুরু করে দেবেন। জলটা বসিয়ে দিয়ে আসি গো।

তোকে চুপি চুপি বলি – তোর বসানো জবা গাছটায় এবার ঢেলে ফুল এসেছে বুঝলি। এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি তোর বাবা চা খেতে খেতে ফুল গুলোকে আদর করছে। নিশ্চয়ই মন কেমন করছে রে! সব ঠিক থাকলে আজ এইসময়ই তো জব্বলপুরে নামতুম। তুমি কিন্তু একদম চিন্তা করবে না। খুব মন দিয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যাও। আর নিজের শরীরের একটু যত্ন নিয়ো। ওখানে তো আর এখন মা নেই, যে সারাক্ষণ টিকটিক করবে! ভাল থেক।

ইতি

তোমার মা

পুনশ্চ – তোমার বাবা খ্যাপাদাকে টিকিট কাটতে পাঠিয়েছে। আশা করি খুব শীগগির দেখা হবে। তারা মাকে রোজ সকালে ডেক একটু (বাসি কাপড় ছেড়ে)।

প্রবাসী বাঙালী দেবতোষ ভট্টাচার্য কর্মসূত্রে আজ বহু বছর ব্যাঙ্গালোরের বাসিন্দা। অবসর সময়ে অল্পবিস্তর লেখালেখির বদভ্যাস আছে, আর লেখার মাধ্যমে যদি একবার বই পড়ার নেশাটি কাউকে ধরিয়ে দেওয়া যায় তবে সেটাই হবে তাঁর মস্ত পাওয়া।

মরা তো আর যায় না!

বন্দনা মিত্র

টবে আঁটবে না গাছটাকে। সাতশ স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাটে জায়গার বড় টানাটানি। একটা তিন বাই পাঁচ ব্যালকনি বের করা হয়েছে কোনমতে। সেই বারান্দায় কাপড় শুকোনোর তার, দুটো গ্যাস সিলিন্ডার, সংসারের বাড়তি ঘটি, বাটি, বালতি, অকেজো টোস্টার, মিক্সার, কম্প্যুটার – সব জড়ো করেও শখ মরে না গেরস্থের - কিছু সবুজও দরকার। তাই জগন্নাথ নার্সারি থেকে ছোট্ট পাম গাছটা কিনে দশ ইঞ্চির একটা টবে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপর সামনের ফুটপাথের ভিখিরি ছেলেটার মত যত্ন না নেওয়া সত্ত্বেও গায়ে গতরে বেড়ে যাচ্ছে অন্যায় রকম। গেরস্থ পড়েছে মুশকিলে, টবের সাইজ বাড়াতে গেলে আর কাপড় মেলার জায়গা থাকবে না ব্যালকনিতে। পামগাছটা বারান্দা থেকে উঁকি মেরে ভিখিরি ছেলেটাকে দেখে, মাটা তার পালিয়েছে কিছুদিন আগে, ছেলেকে ফুটপাথে ফেলে রেখে। টলটলে পায়ে হেঁটে হেঁটে এখানে ওখানে হাত পাতে, খিদে পেলে জবরদস্তি চাইতে হয়, নিজে এসে কেউ দেয় না, ছোঁড়া ঠিক বুঝে গেছে এই হামাটানা বয়েসে।

সাতসকালে সুতপা গাছে জল দিতে এসে দেখল পাতাগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে, শিকড়টা বড্ড চাড়িয়ে গেছে নীচে, কিছু একটা করতে হবে। তারপর ছেলের স্কুলের টিফিন, বরের লাঞ্চ, নিজের অফিসের পুলকার ইত্যাদি ঝামেলায় ভুলেও গেল বেলা গড়াতে। এভাবেই চলে যাচ্ছিল। পাম গাছটা ভাবনায় পড়ল, এরা তো কিছু করবে বলে মনে হয় না। একেবারে শুকিয়ে গেলে ফেলে দিয়ে আরেকটা গাছ কিনে আনবে, কতই বা দাম! খুদে বাচ্চাটা এখন একটু মাথায় বেড়েছে, চায়ের দোকানে রাতদিনের পেটভাতায় কাজ নিয়েছে একটা, কাপ ডিস ধোয়, চা আর বাসি তেলেভাজা খায়, কড়কড়ে ভাতে ডালের জল মেখে খায়, কাস্টমারের পাত কুড়োনো কচুরি আর ঘ্যাঁট খায়, মাঝে মাঝে কাপ ভেঙে মালিকের চড় চাপড় খায়, রাতে উপোষ দিতে হয়। কিন্তু বেঁচে আছে ঠিক, মরে নি।

টব ফেটে মাটি ফুঁড়ে শিকড়টা বেরিয়ে গেছে, ব্যালকনির পাঁচ ইঞ্চির পাঁচিলে ধাক্কা খায় এখন। ফাটা মুখটা দেয়ালে আড়াল থাকায় দেখতে পায় না সুতপা, দেখার সময়ই বা কই! পাঁচিলে একটা ফাট ধরেছে, শিকড়টা মাথা গুঁজে দিয়েছে সেই ফাটলে। এত সহজে মরলে চলবে কেন, চেষ্টা করতে হবে না! চাপ দিয়ে ফাটলের মুখ চওড়া করছে। সুতপার অফিসে খুব চাপ, ছেলের রেজাল্ট মোটেই ভাল হয় নি, টায়ে টায়ে পাশ। অতনুর সঙ্গে প্রায়ই ধুম ঝগড়া এইসব নিয়ে, অবশ্য আজকাল তো অতনু প্রায় সবসময় ট্যুরে থাকে, সংসারের খবর নেওয়ার সময় কই!

ভিখিরি ছেলেটা চায়ের দোকানের কাজের ফাঁকে এখন পকেটমারির ট্রেনিং নিচ্ছে, হাতসাফাইএর সঙ্গে রোজই একপ্রস্ত মারধোর খেতে হয়, ট্রেনিং এর অঙ্গ। পেশি হালকা রাখতে হয় তখন, যেন না লাগে। ওস্তাদ বলেছে আর মাস ছয়েক পর অ্যাকশনে নামাবে, হাওড়ার চালু রুটে অফিস টাইমে মোবাইল হাতানোর কাজ। পাম গাছ দেখে, যাক ছেলেটার উন্নতি হচ্ছে তো! ফাটলটাও বাড়ছে, আর কটা দিন যেতে দাও।

সেদিন হৈচৈ কান্ড, সুতপার ফ্ল্যাটটার ব্যালকনির দেয়াল ভেঙে ইঁটের তাড়া পড়েছে একেবারে আবাসনে ঢোকার রাস্তার ওপর, ভাগ্য ভাল কেউ জখম হয় নি, একটা কেলেঙ্কারি হতে পারত। অতনু ও সুতপাকে দুকথা শুনিয়ে গেল সোসাইটির সেক্রেটারি আর প্রেসিডেন্ট। অন্যান্য ফ্ল্যাটের বাসিন্দারাও ছাড়ল না – উপদেশ দেওয়ার এমন সুযোগ চট করে পাওয়া যায় না। বিশ্রী ঝগড়া লাগল একটা।

পরেরদিন মিস্ত্রি এল, শুরু হল মেরামতি। পাম গাছের জন্য বড়সড় টব এল একটা , সোসাইটিই দিল, তাকে জায়গা দেওয়া হল নীচে মেন গেটের পাশে , দেখতে ভাল লাগবে , জল হাওয়া আলো কোনটার অভাব হবে না।

আরেকটু বেড়েছে পামগাছটা, পাঁচিল টপকে ঝাঁকড়া মাথা বের করে রাস্তা দেখে। ছেলেটারও হালকা গোঁফের রেখা ফুটেছে। আর চায়ের দোকানে কাজ করে না , ভালই হাত পেকেছে । দু চারবার পাবলিক পিটিয়েছেও ধরে , জেল খেটেছে দু চারবার , এখন নতুন ওস্তাদের কাছে বোমা বাঁধা শিখছে। আগামী ভোটে অমুক দলের দাদাদের হয়ে কাজ করবে। দাঁড়িয়ে গেছে ছোঁড়া।

এখন কিছুদিন নিশ্চিন্ত। তবে ঐ কিছুদিনই। টবটা আবার ছোট হয়ে যাবে , শিকড়ে হাঁফ ধরবে আবার। সে যখন হবে দেখা যাবে। উপায় কিছু একটা হয়েই যাবে, ছেলেটার যেমন হয়েছে। লড়াই না করে মরা তো আর যায় না !

অসমাপ্ত ভালবাসা

পুতুল খান

একটি ছেলে facabook দেখছিল,হঠাৎ তার চোখে পড়ল একটি আই ডি নাম "মায়াপরী"। ছেলেটির মনে কৌতুহল হলো,দেখি তার ওয়ালে গিয়েই দেখি।কে এই মায়াপরী।ছেলেটি তার ওয়ালে গিয়ে অবাক হলো।মেয়েটির দেওয়া পোষ্টগুলো মধ্যে কোনটি হাসির,কোনটি দুঃখের,কোনটি ভালোবাসার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী পোষ্ট যাহা ছেলেটিকে আকৃষ্ট করল।তখন ছেলেটি মেয়েটির কাছে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠালো আর মেয়েটিও রিকোয়েস্টটি গ্রহণ করে ছেলেটির সাথে এড হলো।মেয়েটির সুন্দর সুন্দর পোষ্টগুলোতে ছেলেটি লাইক,কমেন্ট করতে লাগল,মেয়েটিও ছেলেটির পোষ্টগুলোতে লাইক,কমেন্ট করছে এইভাবে একটি বছর চলে গেলো।

এর-ই মধ্যে ছেলেটি মেয়েটির ওয়ালে গিয়ে সবসময়ই তার ছবি, পোষ্টগুলো দেখেতে লাগলো এবং মেয়েটির প্রতি অনেক দুর্বল হয়ে পড়ল।কিন্তু ছেলেটি কখনো মেয়েটি ইন-বক্সে গিয়ে একটি বারের জন্যেও Hi,Hello লিখতো না,ছেলেটি অনেক ইচ্ছে হতো মেয়েটিকে কিছু লিখার।মেয়েটি বিরক্ত হবে অথবা রেগে যাবে এইভেবে আর কিছুই লিখতো না।এই দিকে মেয়েটি ভাবত এই ছেলেটি আমার সাথে এড হলো, আমার সব পোষ্টে লাইক,কমেন্ট দিয়ে যাচ্ছে অথচ কখনো ইন-বক্সে গিয়ে কখনো একটি লাইনও লিখছে না,অন্য ছেলেরা এড হওয়ার সাথে সাথে কত বিরক্ত করে,কত কিছু লিখতে চায় যার কারণে কত জনকে ব্লক করলাম আর এতদিন হয়ে গেলো একটি বারের জন্যেও কিছু লিখল না,মেয়েটি ভাবল ছেলেটি হয়ত ভদ্র, ব্যতিক্রমী তাই সে নিজেই একদিন ছেলেটির ইন-বক্সে গিয়ে জানতে চাইল।কেমন আছ ? ছেলেটি উত্তর দিল ভালো আছি।তুমি কেমন আছ? মেয়েটি বলল ভালো।এই থেকে তাদের ম্যাসেজ করা শুরু হলো এবং আস্তে আস্ত ম্যাসেজ করাও বেড়ে গেলো।এইভাবে আরও একটি বছর চলে গেলো।

এইভাবে দুইটি বছর অতিবাহিত হয়ে গেলো।ছেলেটি দিন দিন মেয়েটিকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে শুরু করল। বিভিন্ন ভাবে মেয়েটিকে ভালোবাসার কথা বুঝাইতে চাইত, মেয়েটি বুঝেও না বুঝার ভান করতে লাগলো।মেয়েটি ছেলেটিকে পছন্দ করত কিন্তু প্রেম ভালোবাসা করবে এইরকম চিন্তা মেয়েটির মনে ছিল না। একদিন তারা ম্যাসেজ করতে করতে উভয় উভয়কে তাদের ব্যক্তিগত মোবাইল নাম্বার দিল। What's app.Imo -তে জয়েন্ট হলো।একদিন মেয়েটিই প্রথম ফোন দিল।সেই থেকে উভয়ের মাঝে ফোনে কথা বলা শুরু হলো।মেয়েটির কণ্ঠস্বর ও হাসি শুনে ছেলেটি আরও বেশী মেয়েটির প্রতি দুর্বল হতে লাগলো এবং ভালোবাসাও ক্রমান্বয়ে তার বুকের মাঝে বাসা বাঁধতে শুরু করল।তবুও ছেলেটি মেয়েটিকে সরাসরি ভালোবাসার কথা বলতে পারলনা। তবে বিভিন্ন ভাবে তার ভালোবাসার কথা প্রকাশ করতে লাগল। যেমন নিজের লেখার মাঝে ভালোবাসা কথা বুঝাতে চাইত।ছেলেটি লেখাটির মাধ্যমে কি বুঝাতে চেয়েছে,মেয়েটি বুঝত কিন্তু সঠিক কোন উত্তর না দিয়ে,সে বলত লেখাটি সুন্দর হয়েছে। ছেলেটি ভালোবাসার গান, ভিডিও,পোষ্টের মাধ্যমেও বুঝাতে চাইত তার ভালোবাসার কথা, মেয়েটি বুঝেও সেই একই রকম উত্তর দিত, অপূর্ব,খুব সুন্দর,খুব ভালো হয়েছে।তখন ছেলেটির হতাশ হয়ে যেত।আবার মনে মনে ভাবল,সে মনে হয় সরাসরি আমার মুখেই শুনতে চায় ভালোবাসা কথা।এই ভেবে ছেলেটি আবার মনে প্রেরণা নেয়, এইবার সরাসরিই বলব।আজ বলব,কাল বলব করে সে বলতেই পারছে না সাহসই পাচ্ছেনা।এইভাবে আরও কিছুদিন চলে গেলো।

অত:পর ছেলেটি একদিন মেয়েটিকে ভালোবাসার কথা বলেই পেলল,মেয়েটি তার কোন সরাসরি জবাব না দিয়েই ছেলেটিকে বলতে লাগল,শুন আমিও তোমাকে খুব পছন্দ করি এবং ভালোবাসতে আমারও ইচ্ছে হয়,যখন উভয় উভয়কে ভালোবাসতে শুরু করব তখনই পাওয়া না পাওয়ার হিসেব এসে যায়।

আমাকে তো তুমি পাবে না।আমার পরিবার একটি ছেলে দেখে রেখেছে,সে মেডিকেলে পড়ালেখা শেষ করেছে,বাবার বন্ধু ছেলে।ছেলেটিকে আমার পছন্দ না কিন্তু পরিবারের সবাই চায়। পরিবারের মতামতের বাহিরে গিয়ে কিছু করাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়।মেয়েটির কথা শুনে ছেলেটি কিছুক্ষণ চুপ থেকে স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করল, এরপর ছেলেটি বলল আমি তোমাকে ভালোবাসি এইটা সত্য, তুমি যেইখানেই থাকো, যেভাবেই থাকো,যার সংসারেই থাকো আমি এখন যেভাবে ভালবাসছি চিরদিনই একই ভাবে ভালোবেসে যাব।পাওয়া না

পাওয়ায় আমার ভালোবাসায় একটু কমতি হবে না। তোমার যদি সম্ভব হয়, তোমার মনে যদি একটু জায়গাও করে নিতে পেরেছি ভাব তাহলে প্রতিদিন একটিবারের জন্যেও আমাকে স্মরণ করবে আর আমাকে যে স্মরণ করছ তা আমি বুঝব,একটি ম্যাসেজ Hi,Hello লিখে চলে গেলেও আমি ভেবে নিব তুমি আমাকে মনে রেখেছ।ছেলেটি কথা শুনে মেয়েটি কেঁদে ফেলল আর বলল এত ভালোবাস আমায়।

ছেলেটি বলল হুম, খুব বেশী ভালোবাসি তোমায়। মেয়েটির সব বিষয় জানার পরও ছেলেটির ভালোবাসা একটুও কমে গেলো না।আগের মতনই দু'জন দু'জনকে সময় দিয়ে যাচ্ছে।এর কিছুদিন পর মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেলো।বিয়ের পরেও মেয়েটি ছেলেটির কথা অনুযায়ী, শত প্রতিকূলতা শর্তেও ছেলেটিকে প্রতিদিন একটু হলেও সময় দিয়ে যাচ্ছে।

এইভাবে তাদের দুইজনের সম্পর্কটি খুবই মিষ্টি মধুর হতে লাগলো।একজন একজনকে তাদের সকল সুখ দুঃখের বিষয়গুলো শেয়ার করতো। প্রতিদিনই তারা সময় করে কথা বলত। অবশেষে তাদের দু'জনের মাঝে একটি ভালো বন্ধুত্বের মেরুকরণ তৈরি হলো।

আসলেই ভালো সম্পর্কগুলো কখনোই শেষ হয় না। সম্পর্কটা ফেইসবুকে হলো,না কি ভাবে হলো তাতে কিছুই যায় আসেনা। ভালো Friendship দিয়েই সব কিছু জয় করা যায়। Friendship is always a sweet responsibility never an opportunity.

পুতুল খান আপস্টেট নিউইয়র্কে থাকেন । অবসর সময়ে গল্প ও কবিতা লিখতে ভালবাসেন ।

আমার ভালোবাসা

পুতুল খান

পাখিরা যেমন ডানা মেলে ফেরে নিজের নীড়ে,

তুমি এসেছিলে আমার জীবনে স্বপ্ন ভরা হৃদয় নিয়ে।

হৃদয়ে ছিল ভালোবাসা সংসারে ছিল সুখ,

এমন করেই চলছে চারটি বছর হাসিখুসি তে ভরা মুখ।

চাইবো আরো সাত জন্ম তোমায় পেতে আমার জীবনে,

এমন ভাবেই থেকো তুমি আমার প্রেমের বন্ধনে।

রামধনুর সাতটি রঙে ভরিয়ে দিব তোমার জীবন,

ভালোবাসা থাকবে অমর হয়ে, হবেনা কখনো মরন।

দেখেছি তোমার কাজল লতা ওই হরিন রাঙা চোখ,

ভালোবাসবো আমি প্রতিদিন যতই দেখুক লোক।

ভায়রা-ভাই

গৌতম সরকার

একই সাথে কান ধরে বেঞ্চের উপর দাঁড়ানো, বা ক্লাসরুমের বাইরে নিল-ডাউন হবার পর স্কুলের বন্ধুরা যখন হয় ভায়রাভাই

ধ্রুবর সাথে আলাপ সেই ৭০-এর দশকের শেষার্ধ থেকে, যখন আমরা একই সাথে বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাই স্কুলের ক্লাস ওয়ানে ভর্তি হলাম। স্কুলে যাতায়াত করতাম স্কুলের বাসে। বালিগঞ্জের বাড়ি থেকে কয়েক পা হাঁটলেই গোলপার্ক, আর সেখান থেকেই স্কুলের বাসে ওঠা-নামা। ভোরবেলা তো মা ভালোয় ভালোয় বাসে উঠিয়ে দিতেন। কিন্তু ফেরার সময়? বাস থেকে যদি ঠিকঠাক না নামি, বা অন্য কোথাও ভুলভাল নেমে পড়ি, তাহলে? তাতেই মায়ের চিন্তার শেষ ছিল না। মা মোটেই রাজী ছিলেন না যে আমি এত দূরে স্কুলে যাই (আসলে কিন্তু হেঁটেই যাওয়া যায়!)। বাড়ির কাছেই তো জগবন্ধু (জগদ্বন্ধু), আর তা না হোলে আর দু পা এগোলেই পাঠভবন বা সাউথ-পয়েন্ট, তা হোলে? কিন্তু বাবা-কাকারা নাছোড়বান্দা। এই স্কুল থেকে নাকি প্রতি বছরই স্কুল-ফাইনালে 'স্ট্যান্ড' করে, কোনো কোনো বছর নাকি ফার্স্ট-সেকেন্ড-থার্ড সব একই সাথে! অগত্যা মায়ের বারণ ধোপে টিকল না।

মা তাই রোজই পাখী পড়ানোর মতো করে আমাকে বলে দিতেন যে "স্কুল ফেরত ঐ যখন গোলপার্কের বিবেকানন্দের মাথা দেখতে পাবে, জানবে তখনই বাস থেকে নামতে হবে"। আমার কি ছাই আর অত মনে থাকে, যে কখন বিবেকানন্দের মাথা দেখতে হবে? কিন্তু হুসেইনদার (ড্রাইভার) বাসে আরও একজন থাকতেন, যার কাজই ছিল আমাদের ঠিকঠাক নামিয়ে দেওয়া। বয়সে হয়ত তিনি আমার বাবার চেয়েও বড়, কিন্তু সবাই তাঁকে বলত 'ধ্রুবদা'। ভোরবেলা মায়ের কথা তাই আর তেমন গায়ে মাখতাম না, জানতাম যে আমি ভুলে গেলেও ধ্রুবদা ঠিক নামিয়ে দেবেন! পরিত্রাতা ধ্রুবদা! এরই সাথে আর একটা জিনিস নজরে এল, আমাদের ক্লাসের ঐ কালো করে ছেলেটা; যে ঐ পার্ক সার্কাসের মাঠের দিকটায় স্কুলবাস থেকে নামে, ওর নামও তো ধ্রুব!

তারপর কোথা দিয়ে সময় চলে গেল। মর্নিং-সেকশন, 'মুনমুন সেন' পাড়ি দিয়ে আমারা পাড়ি জমালাম ডে-সেকশনে। বেশ বন্ধুত্ব হয়েছে তত দিনে ধ্রুবর সাথে! একবার একটা কথা শুনে কেমন যেন অদ্ভুত মনে হোল ছেলেটাকে; ও নাকি বড় হয়ে ইন্ডিয়ান ক্রিকেট টিমের ক্যাপ্টেন হতে চায়! এ আবার কেমন কথা? আমি তো জানতাম বড় হয়ে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হতে হয়!

এরই মধ্যে মা পাড়ি দিলেন এক অন্য জগতে। সব কিছুই কেমন যেন ওলট-পালট হয়ে গেল, পৃথিবীটাই কেমন যেন ফ্যাকাসে, বিস্বাদ আর পানসে হয়ে গেল। এইসবের মধ্যেও ধ্রুবর উপস্থিতি ছিল বিশেষ ভাবে।

ক্লাস সেভেন থেকে আর স্কুলের বাসে যাতায়াত করা যায় না। অগত্যা পাবলিক বাস। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ডানা গজালো আমাদের। স্কুল ফেরত পাবলিক বাসের বদলে যদি হেঁটে যাওয়া যায় খানিকটা পথ, বা পুরোটাই; তাহলে? তাহলে তো ক্লাসের আড্ডাটা আরও একটু বাড়ানো যায়, নয় কি? তেমনই হোল। স্কুল থেকে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড ধরে হেঁটে, সুচিত্রা সেন-মুনমুন সেনদের বাড়ি পেড়িয়ে, বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজ ছাড়িয়ে সোজা বালিগঞ্জ ফাঁড়ী। সেখান থেকে ধ্রুব বাসে যেত পার্ক সার্কাসের দিকে, আর আমি আর একটু হেঁটে উল্টোমুখে গড়িয়াহাট-গোলপার্কের দিকে! সাথে আরও কয়েকজন থাকত, সুমন্ত (চক্রবর্তী), চন্দ্র (চন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী), হোজো (জ্যোতির্ময় দত্ত), ইন্দ্র (ইন্দ্রনীল চ্যাটার্জি), কল্লোল (রায়) - এরা। মাঝে-সাঝে যোগ দিত প্রমিত (মুখার্জি), বা গৌরাঙ্গরা (চ্যাটার্জি)। মাঝপথে সপ্তপর্ণীতে সুমন্তর বাড়িতে আড্ডা হোতো অনেক সময়। এই সময়ই বাড়ল ধ্রুবর সাথে বন্ধুত্ব! এখন থেকে আর শুধু স্কুল, বা স্কুল ফেরত রাস্তায় নয়, একে অপরের বাড়িতেও যাতায়াত শুরু হোল; আড্ডাও বাড়ল! ধ্রুবর বাড়িতে গেলে কাকু-কাকিমা (ধ্রুবর বাবা-মা) খুশী হতেন, বিশেষত কাকিমা। মনে হোতো যে কিছুক্ষণের জন্য হলেও, উনি আমার মায়ের অভাবটা কোন না কোন ভাবে পুষিয়ে দিতে চান। একই সাথে জুটি বেঁধে আমি আর ধ্রুব জিতেছিলাম আমাদের স্কুলের বাৎসরিক ক্যারাম-চ্যাম্পিয়নশিপ, আমাদের ক্লাস নাইনে; এমনকি স্কুলের ক্লাস টেন,ইলেভেন বা টুয়েলভের বড় বড় দাদাদেরও হারিয়ে দিয়ে!

মাধ্যমিক এল, গেল। তেমন কিছুই টের পেলাম না। শুনেছিলাম আমাদের স্কুলের ফেল করা ছেলেও নাকি মাধ্যমিকে ফার্স্ট ডিভিশন পায়, স্টার পায়; ঠিক তেমনটাই হোল, সেটাই দেখলাম। উচ্চমাধ্যমিক এল। সবার মধ্যেই আই.আই.টি আর জয়েন্ট-এন্ট্রান্স পরীক্ষার হিড়িক পোরে গেল; ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হবার বাসনায়। ধ্রুবর মধ্যে এই ব্যাপারে তেমন কন হেলদোল দেখলাম না, ও বোধহয় বেশী ব্যস্ত ছিল ইন্ডিয়ান ক্রিকেট টিমের সাফল্য কামনায়!

ঐ সময় নাগাদ ধ্রুব মাঝেসাঝেই নর্থ-বেঙ্গলে ওর কাকাদের বাড়িতে বেড়াতে যেত স্কুলের ছুটিতে, ফিরে এসে আমাকে ওদিককার গল্প শোনাত; ওদিককার মানুষরা নাকি অন্য রকম, এদিককার থেকে ভালো। ওখানে নাকি অমুক বাড়ির অমুক কাকিমা তমুক বাড়ির তমুক মামিমার বাড়ি বেড়াতে গিয়ে নির্বিকার ভাবে কুটনো কেটে বা বাটনা বেঁটে গল্পগুজব সেরে দিব্যি নিজের বাড়ি ফেরত আসেন! আমারও আর কোলকাতায় মন টিকছিল না। বাইরে কোথাও যাব সেটাই মনে মনে ঠিক করলাম। কিন্তু আমার মনে তখন নর্থ-বেঙ্গল নয়, শুধুই অ্যামেরিকা!

কিন্তু মুখ ফুটে বাড়ির কাউকে সে কথা বলার সাহস পেলাম না; ছোট মুখে বড় কথা, বামুন হয়ে চাঁদ ধরা – এইসব শোনার ভয়ে। বাড়িতে লুকিয়েই শুরু করলাম অ্যামেরিকান ইউনিভার্সিটিগুলোতে অ্যাপ্লাই করা, আর SAT-TOEFL পরীক্ষার প্রস্তুতি। কিন্তু এইসব করতে টাকা লাগে যে! তা পাব কোথায়? কয়েকটা প্রাইভেট টিউটরিং শুরু করলাম। কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। এত কথা পেটে চেপেও রাখতে পারছিলাম না। বলেই ফেললাম দুই-একজনকে। ধ্রুব তাদেরই একজন। শুনে ও অবাক হোল না খুশী হোল তা ঠিক বুঝলাম না। ও শুধু জিজ্ঞেস করলো যে কত টাকা লাগবে আমার, ঐ পরীক্ষা দুটোয় বসতে?

দিন কয়েক বাদে দেখি ও সকাল সকাল এসে হাজির আমার কাছে। এই সময় সাধারণত ও আসে না। বললাম কি রে, কি ব্যাপার, এই সাত-সকালে? দেখি ও ওর পকেট থেকে টাকা বার করছে। বলল যে “নে এই টাকা কটা রাখ, দেখছি আর কি করা যায় তোর ঐ SAT-TOEFL–এর জন্য”! এবারেও ‘পরিত্রাতা ধ্রুব’, শুধু ‘দা’-টা বাদ দিয়ে।

৩০০ টাকা! ঐ সময় আমার কাছে অনেক। হিসাব করে দেখলাম যে এতে আমার TOEFL-এর fee হয়ে যাবে। আর আমার টিউটরিং থেকে SAT-এর fee! কেল্লা ফতে! বন্ধুর বাড়ি পড়তে যাচ্ছি – এই মিথ্যা ফেঁদে বাড়ি থেকে পালিয়ে পরীক্ষা দুটো দিলাম, পাল্লা দিয়ে চালালাম অ্যাপ্লিকেশান করা। ক্রমে বাড়িতে জানাতে বাধ্য হলাম। অ্যামেরিকা থেকে এত চিঠি-পত্র আসতে লাগল বাড়িতে, যে না জানিয়ে আর উপায় ছিল না। তারপর একদিন এল সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত চিঠিটা – অ্যাক্সেপটেন্স লেটার, উইথ স্কলারশিপ!

ধ্রুব এমনিই একদিন দেখা করতে এসেছিলো। ওকে জানালাম। শুনে আমাদের শোয়ার ঘরটার মধ্যেই ও বার কয়েক লাফাল, তারপর জড়িয়ে ধরে, চুমু খেয়ে, একেবারে একাকার কাণ্ড! আমার দেশ ছাড়ার দিনও ও এসেছিল, এয়ারপোর্ট পর্যন্ত। সেদিন আর কোন লম্ফ-ঝম্প ছিল না। বিদায় জানানোর সময় শুধু দেখলাম যে ওর চোখের কোণ থেকে ঝড়ে পড়ল কয়েক দানা মুক্ত। আমিও মুখ লুকিয়ে হাঁটা দিলাম এমিগ্রেসান অফিসের দিকে।

এরপর অ্যাটল্যান্টিক আর প্যাসিফিক ছাড়াও আমাদের আলাদা করে দিলো প্রায় বারো ঘন্টার ‘টাইম-ডিফারেন্সে’ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের রুটিন আর আমাদের সামগ্রিক জীবন ধারার তফাৎ, প্রায় বছর ২৫ যাবত। তারই মাঝে যতবার ভারতে এসেছি, ওর সান্নিধ্য পেয়েছি খুব কাছ থেকে; কোলকাতায়, মুর্শিদাবাদে, শিলিগুড়িতে। ও ঠিক মনে রাখে যে আমি কোন ধরনের গল্পের বই পড়তে বা গান শুনতে ভালোবাসি, তাই আগাম কিনে বা জোগাড় করে রাখে সেগুলো আমার জন্য! এগুলোর অনেক কিছুই অ্যামেরিকাতেও পাওয়া যায়, কিন্তু ওর কাছ থেকে পেতেই আমার বেশী ভালো লাগে; গল্পের স্বাদ বেড়ে যায়, গানগুলোও যেন আরও বেশী শ্রুতিমধুর লাগে! ওর ধারণা যে ওর দীর্ঘদিন যাবত অ্যামেরিকা-বাসী বন্ধু বোধহয় আর ভারতীয় বিধি-ব্যবস্থায় ততটা সড়োগড়ো নয়, তাই দেখা করার সময়ও আগলে রাখে আমাকে (অনেকটা আমার দাদার মতো, দাদার কথা পরে লিখব)। আমাকে ওর কাছে যেতে হয় না, ওই আসে আমার সাথে দেখা করতে; যখন, যেখানে, যেমন ভাবে সম্ভব। একসাথে কোথাও যাওয়ার থাকলে ওই এসে আমাকে নিয়ে যায়; ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি বা ট্রেন-ভাড়া দিয়ে। এমনও হয়েছে যে আমি

ওর বাড়ি থেকে সরাসরি গেছি আমার মুর্শিদাবাদের 'দেশের' বাড়ীতে, কিন্তু ট্রেনের টিকিটটা পয়সা খরচ করে কেটে আমাকে ট্রেনে উঠিয়ে দিয়েছে ওই, ট্রেন ছাড়া পর্যন্ত আমার জানলার পাশে প্ল্যাটফর্মে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে!

এই সূত্রেই সম্প্রতি সম্ভব হোল ওর শালীর সাথে আমার বিয়ে; কারণ অ্যামেরিকা থেকে আমি যখন কোলকাতায় এসেছিলাম, তখন হটাত কোরে ধ্রুব ওর কর্মস্থল শিলিগুড়িতে আমাকে ওর কাছে বেড়াতে না নিয়ে এলে হয়তো এমনটা হওয়ার কন সম্ভাবনাই ছিল না! এই প্রসঙ্গে একটা মজার ব্যাপার মনে পড়ে। আমরা যখন ক্লাস সেভেন বা এইটে পড়ি, ধ্রুব তখন একাই একদিন এক অদ্ভুত সমীক্ষা চালিয়েছিল, আমাদের কুড়ি মিনিটের টিফিন-ব্রেকটার মধ্যেই। সেইদিন ও আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু বান্ধবদের একক আর আলাদা ভাবে জিগ্যেস করেছিল যে সুযোগ হোলে আমরা অন্য কোন ক্লাসমেটের সাথে একসাথে থাকতে চাইব কিনা, রুমমেট বা একই পরিবারের সদস্য হিসাবে। যে কোন দুই বন্ধুর ইচ্ছা আর উত্তর মিলেমিশে এক হোয়ে যায় কিনা সেটা জেনে নেওয়াই ছিল ওর উদ্দেশ্য! এমনটা যে বাস্তবে সম্ভব, তা কিন্তু ভেবেছিল ঐ ছোট্ট ধ্রুবই! এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো যে সেদিন আমার সাথে যার উত্তর মিলে গিয়েছিলো, সে ধ্রুব নয়, তপদেব (চক্রবর্ত্তী)।

বন্ধুতো ও ছিলই, বরাবরই। ধ্রুব এখন আমার ভায়রাভাইও বটে। আমি ভাগ্যবান, এ ছাড়া আর কি বা বলতে পারি? আমরা একই পরিবারের সদস্য, সেটাই বা আর আশ্চর্য কি?

বিয়ে উপলক্ষে ধ্রুবকে বেশ কয়েকদিন একসাথে খুব কাছে পেলাম। ওর শালীর সাথে ওর বন্ধুর বিয়েতে ওর ছুটো-ছুটি, দৌড়া-ঝাঁপের কোন অন্ত ছিল না। বিয়ে করতে কোলকাতা থেকে আমি যখন সপরিবারে শিলিগুড়ি এসে পৌঁছালাম, তখন নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে আমাদের নিতে এসেছিল ধ্রুব। বিয়ের লগ্নে ফুল দিয়ে সাজানো গাড়িতেও আমাকে নিয়ে যেতে এসেছিলো ওই। ওর শোওয়ার ঘরে, ওর বিছানায় বাসর-রাত কাটালাম – বৌ সাথে থাকলেও মনের অনেকটা জায়গা জুরে ছিল শুধুই ধ্রুব। মনে হোল যে বিগত ২৫ বছর কখন যেন তলিয়ে গেছে ঐ অ্যাটল্যান্টিক বা প্যাসিফিকের কোন অতল গহ্বরে!

পেশায় রসায়নবিদ বা অধ্যাপক গৌতম সরকারের নেশা ভ্রমণ আর লেখা। কোলকাতায় বেড়ে উঠলেও গৌতম আসলে 'পৃথিবীর।

সিঁদুর খেলা

দেবাশিস দাস

গতকালই পুজোমন্ডপে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। প্রতিমা বরণ, সিঁদুরখেলা সকাল ৯টা থেকে শুরু। কারণ নিরঞ্জনের জন্য প্রতিমা বের করা হবে ১১টা-র মধ্যে। এখান থেকে ইছামতী ঘন্টাখানেকের রাস্তা । বিসর্জনের নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে যাওয়া, প্রতিমা নামানো ইত্যাদি করতে দু'টো বেজে যাবে। বিসর্জনে আরও দু'ঘন্টা ধরলে, ৪টে কি ৫টার মধ্যে সব কাজ শেষ করে ৬টার মধ্যে ফিরে আসা যাবে। আজকাল সময় ভাল নয় । সাথে মহিলারাও যাবে। গ্রামের রাস্তা অনেকটাই হাল্কা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। বিকেল বিকেল ফিরে আসা ভাল। জায়গাটা বনগাঁ স্টেশন থেকে বেশ কিছুটা দূরে বাংলাদেশ বর্ডারে। সাধারণ চুরি ডাকাতি বাদ দিলেও মহিলাদের ওপর অত্যাচার অনেক বেড়ে গেছে । রাস্তায় বের হলে হাত ধরে টানাটানি, কটূক্তি, এমনকি শ্লীলতাহানি আজকাল তো আকছারই হচ্ছে । এই তো সেদিন গ্রামের একটি ক্লাস টেন-এ পড়া মেয়ে সন্ধ্যের মুখে টিউশন থেকে ফিরছিল। স্কুলেরই উঁচু ক্লাসের একটা ছেলে তার দু'একজন গুন্ডা বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে মেয়েটাকে ডেকে তারপর জোর করে পাশের জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে তার ইজ্জত লুন্ঠন করে চাকু মেরে পালিয়ে গেছে । কিন্তু মেয়েটি প্রাণে মরেনি । এখন হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। ফলে পুলিশ কেস, আইনি চক্কর। এদিকে গ্রামের মেয়ের এই অবস্থা হওয়াতে পুরো পুজোটাই বেশ থমথমে কেটেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে উদ্যোক্তাদের এইভাবে বিসর্জন বিকেল বিকেল করে ফেলা খুবই সমীচীন।

তপনও সেই মতো সকাল সকাল তৈরি হয়ে মন্ডপে চলে এসেছিল। সে পুজোর বিসর্জন কমিটিতে আছে। বরণ, সিঁদুরখেলা ইত্যাদি যাতে সুষ্ঠুভাবে সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয় এই দায়িত্ব তাকে দিয়েছেন পুজোর সেক্রেটারি টুটু চৌধুরী। তপন বলেছিল এই পুজোর কোনো অনুষ্ঠানে থাকবে না, কারণ ঐ নিপীড়িত মেয়েটি সম্পর্কে তপনের মামাতো বোন। পরিবারের সকলেই পুরো বিপর্যস্ত। তবু টুটুদার কথায় সে কাজ করে যাচ্ছে।

এমনিতে কাজ অনেকটাই এগিয়ে গেছে। প্রতিমা বেদী থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। সামনে পাশের স্কুল থেকে আনা ছোট ছোট বেঞ্চ পাতা আছে। যাতে মহিলারা তার ওপর উঠে প্রতিমা বরণ করতে পারেন । ঢাকি ঢাকে বাজাচ্ছে বিসর্জনের বোল 'ঠাকুর থাকবে কতক্ষণ, ঠাকুর যাবে বিসর্জন'। এইভাবে চললে ১১টা না হোক, ১১-১৫ / ১১-৩০এর মধ্যে ঠাকুর রওনা করিয়ে দেওয়া যাবে। বরণ করে মহিলারা সিঁদুর খেলছে। বরণের সন্দেশ খাওয়াচ্ছে একে তাকে। দু'একটা সিঁদুরমাখা সন্দেশ তপনের ভাগেও জুটেছে। বরণের ব্যাপারটা জমে উঠেছে। শাগরেদ বিল্টুকে ব্যাপারটা দেখভাল করার দায়িত্ব দিয়ে সে বাইরে বেরিয়ে এল একটা সিগারেট খাওয়ার জন্য। পুজোটা হয় গ্রামের লাগোয়া একটা ফাঁকা জায়গায়, যেখানে বাচ্চারা খেলাধুলা করে।

মন্ডপ থেকে বেরিয়ে তপন একটু হেঁটে একটা পুকুরপাড়ে বসে সিগারেট ধরাল। এখান থেকে পুজো প্যান্ডেলটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ঢাকে বিসর্জনের বোল, আর শরতের মিঠে রোদ্দুর। চোখদু'টো বুজে এল একটু। সবাই মন্ডপের ভেতরে।হঠাৎ মনে হল বিসর্জনের বাজনা বা ঢাকের বোলটা কেমন যেন উত্তাল হয়ে উঠল। খানিকটা যুদ্ধের দামামার মত শোনাচ্ছে। আর তখনই দেখতে পেল সেই দৃশ্য। একজন দু'জন করে সিঁথিতে মুখে গায়ে সিঁদুরে মাখামাখি মহিলারা বেরিয়ে আসছে। মনে হচ্ছে যেন সিঁদুর নয়, রক্ত। এক একজন যেন এক একটি দূর্গা, কারও হাতে ত্রিশূল, কারও হাতে খড়্গ, কারও হাতে গদা। সকলের খোলা চুল, শাড়ির আঁচল হাওয়ায় উড়ছে। দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছে এই বীরাঙ্গনারা, অত্যাচারের বিরুদ্ধে, নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য। খবরের কাগজে আর যেন কোনদিন খবর না হয় পার্কস্ট্রীট, কামদুনি, বদায়ু, দিল্লী, বুলন্দশহর....। ঢাকের দামামা বেজে চলেছে। সিঁদুর উড়ছে হাওয়ায়। কে ওদের এ ভাবে রূপ দিল আজ বিসর্জনের দিন! বিসর্জন কিসের? মানুষের ভেতরের অসুরের কি? কে ওদের এ ভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ করে দিল?

'এই তপওওন' – সেক্রেটারি টুটুদা'র ডাকে চমক ভাঙলো তপনের। দেখল ট্রাক এসে গেছে, প্রতিমা তুলতে হবে। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল মন্ডপের দিকে। ঢাক বেজে চলেছে বিসর্জনের তালে। তারই মধ্যে দামামার বোলটা খুঁজছিল তপন।

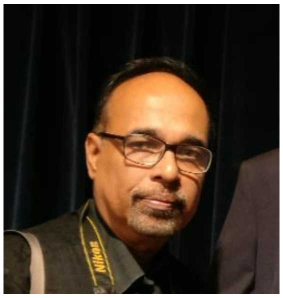

দেবাশিস দাস কর্মসূত্রে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে বর্তমানে দেরাদুনে একটি 'তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস অনুসন্ধান' সংস্থায় কর্মরত। সাহিত্যচর্চার ভুত কাধে সওয়ার থাকলেও, কিছু বিক্ষিপ্ত লেখালেখি ছাড়া নিয়মিত-ভাবে পাঠকের দরবারে আসা হয়ে ওঠে নি। 'পরবাস' ওয়েবজিনের সম্পাদক মন্ডলী কয়েকটি লেখা তাদের পত্রিকায় স্থান দেওয়াতে ইনি যার পর নাই উৎসাহিত হয়ে ভালো লেখা বা সিরিয়াস লেখার স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছেন। বাকিটা আছে ভবিষ্যতের গর্ভে।

অঞ্জলি দাশ

একান্নপিঠ

তুমি চেয়েছিলে তাই ছড়িয়ে রয়েছি,

যেখানে যেখানে তোমার ইচ্ছেরা পৌঁছুতে চায়...

উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম... দশ দিকে,

সর্বসহ অষ্টপ্রহর জেগে আছি,

যাদু অন্ধকারে আত্মপরিচয় ঢাকা।

তুমি চেয়েছিলে তাই

একান্ন টুকরো হয়ে অপেক্ষা করছি দেখ।

তোমার ইচ্ছের হাত যতদূরে যাবে,

তোমার জিভের স্বাদ, নিঃশ্বাসের অবাধ বাতাস,

সবদিকে পরিচর্যা দিই দশ হাতে।

আত্মগোপনের জন্যে অন্ধকূপও প্রস্তুত রেখেছি।

শুধু আয়নার সামনে এসে ফাঁকা লাগে;

ছিন্ন হাত, চোখ, জিহ্বা, কপাল, কপোল,

কিংবা সেই নারীচিহ্ন, সেও ফুল চন্দনের নিচে চাপা পড়ে আছে।

বায়বীয় শরীরের মধ্যে শুধু খিদে তেষ্টা ডানা আছড়ায়।

ডানা

এত পথ পেরোতে পেরোতে কিছু তো ভেঙেছে।

ভাঙা ডানা কোথায় রেখেছ?

টের পাও মাঝরাতে ঘুমের ভেতর

বাতাস কু-পরামর্শ দেয়?

ভোরবেলা স্বপ্নের পৃষ্ঠা খুলে দেখে নাও

কার যেন অস্থির পায়চারি কাটাকুটি দাগ রেখে গেছে।

সাদা কালো ছবির আড়ালে অন্য রঙে কেউ যেন লিখে গেছে

ঝাপসা কোনও গল্পের ইঙ্গিত...

ডানা দুটো যত্নে রেখো মেয়ে।

অঞ্জলি দাশ

অশ্রুসংক্রান্ত

এখন আর চোখের জল জমিয়ে রাখি না,

কান্নার অর্থ করি খরাত্রাণ, কান্নাকে অর্থকরী করি

যেখানে আবেগহীন কথাচাষ···সেইখানে,

চুম্বনের ঠিক আগে থেমে আছে ঠোঁট...সেইখানে,

নিরালম্ব ব্যথা আর কঠিন বিষাদ জমে পাথরের ঘর...

সেইখানে অবশিষ্ট বিন্দু রেখে জীবন মুঠোয় তুলি।

সম্পর্কের সূত্র

বন্ধুদের ভুলগুলো আতরের মতো স্পর্শ করি,

শত্রুদের ঔদ্ধত্যকে শিশির বিন্দু দিয়ে ধুয়ে বলি,

এর নাম বৃক্ষের শুশ্রূষা।

হেরে গিয়ে বিজয়ীকে আলিঙ্গন করে বলি জিতে গেছি,

এভাবে গুছিয়ে রাখি সম্পর্কের ঘর।

অঞ্জলি দাস তরুণ বাঙালির এক জনপ্রিয় কবি। মনোবিজ্ঞানে মাস্টার্স ডিগ্রী করেছেন। শিশুকাল থেকেই গল্প ও কবিতা লেখায় পারদর্শিনী। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মারক পুরস্কার পেয়েছেন ২০১০ সালে এবং বেঙ্গলি একাডেমী পুরস্কার পেয়েছেন ২০১৪ শনে, বাংলা কবিতায় মৌলিক অবদানের জন্য। শ্রীমতী অনন্যা বাংলা ছোটগল্প ও উপন্যাসও লেখেন। দেশ, আনন্দবাজার, সানন্দা, ওয়েব ম্যাগাজিন পরবাস, এবং অন্যান্য পত্রিকাতে নিয়মিত ভাবে লিখে থাকেন।

বাঁ চা র ম জা

সুদীপ্ত বিশ্বাস

আমি তো বেশ ভালই বেঁচে আছি
তোমায় ছেড়ে দিব্যি একা একা,
অনেকটা রাত চাঁদের সঙ্গে জাগি
সকালে পাই টুনটুনিটার দ্যাখা।
ল্যাপটপ বা স্ক্রিন টাচ মোবাইলে
ফেসবুকে রোজ নতুন কিছু লাইক,
দেশটাও বেশ গড়গড়িয়ে চলে
ইনফ্লেশান, দ্রব্য মূল্য হাইক-
সবকিছু বেশ সয়ে গ্যাছে আজকাল
ভালবাসাও পদ্ম পাতার জল
একজীবনে ও মেয়ে তুই এসে
কতটা আর দুঃখ দিবি বল?
মন খারাপের মেঘেরা ভেসে গ্যাছে
অনেক দূরে, দূর পাহাড়ের গায়ে,
নদীর তীরে একলা হাঁটি আমি
ছলাৎ-ছলাৎ ঢেউ এর রাশি পায়ে।
মরুভূমির উট হারিয়ে গেলে
হেঁটেই চলে একলা বেদুইন,
মরীচিকার মিথ্যে জলের খোঁজে
ঘুরে বেড়ায় প্যারিস, জাপান, চীন।
আমিও যাই ছোট্ট নদীর তীরে
রোজই করি টুনটুনিটার খোঁজ,
বাতাস মেখে তাধিন-তাধিন বাঁচি
বাঁচার মজায় বেঁচেই থাকি রোজ...

পুনরুত্থান

সুদীপ্ত বিশ্বাস

নিভু নিভু আকাশে যেই ঘনিয়ে এল মেঘ

তোমার চোখের তারায় তারায় দেখেছি উদ্বেগ।

অনেক চেনা কেমন করে খুব অচেনা হয়

জীবন খাতা গোলকধাঁধা সরলরেখা নয়।

শান্ত জলে হঠাৎ হঠাৎ ছলকে ওঠে ঢেউ

ঘুমের মাঝে চমকে দেখি পাশেতে নেই কেউ।

নেই তাতে কি, একলা বাঁচি, একাই টানি দাঁড়

স্বপ্ন দেখি আকাশ ছোঁব, সমুদ্দুরের পার...

পাতকী

সুদীপ্ত বিশ্বাস

এসেছে প্রেমিক যুবা প্রেম ভেঙে গেলে

পাষণ্ড পুলিশ থেকে ডাকাতের দল

সব্বাই এসেছে আর ঢেলে গেছে বিষ।

ধোয়া তুলসী পাতা যে সেও তো এসেছে

এঁটো পাতে চেটেপুটে খেয়ে চলে গেছে।

এসেছে উকিল বাবু এসেছে সন্ন্যাসী

মুখ পাল্টাতে এসেছে গৃহস্থ মানুষ।

এসেছে জুতো বিক্রেতা, জুতো কেনে যারা

তারাও এসেছে সব গাঁ উজাড় করে।

কি নেবে গো দেহ থেকে? দেহে কি বা আছে?

নর দেহে যত পাপ সব মুছে নিয়ে

রক্ত মাংস বিষ মেখে অন্তরে অন্তরে

ধর্ষিত হয়েছি রাতে অযুত বছর।

সমস্ত শরীর দিয়ে বিষ শুষে নিয়ে

অপবিত্র তবু আমি, কুলটা, পাতকী!

বাক্যহারা

সুদীপ্ত বিশ্বাস

রাতদুপুরে আসছে উড়ে একটা দুটো স্বপ্ন পাখি

হারানো সেই সোনালি দিন, এখন একে কোথায় রাখি!

আবছা আলোয় চমকে দেখি সেই যে তুমি মেঘের মেয়ে

কলসি নিয়ে দুপুরবেলা একটু দুলে ফিরছ নেয়ে

হালকা রঙা কল্কা শাড়ি, দুলছে বেণী ইচ্ছেমত

স্তব্ধ চোখে থমকে থাকি, আরে এটাই সেই ছবি তো!

সেই যে যেটা হারিয়ে গেছে একটুখানি অসাবধানে

আজ পুরোটা রাখব ধরে, আজকে লিখে রাখব প্রাণে।

গভীর রাতে আবছা আলো, হতেও পারে চোখের ভুল

বলো না তুমি সত্যি করে,তুমি কি সেই টগরফুল?

যাচ্ছে খুলে স্মৃতির পাতা,ডাগর চোখে দেখছি খালি

অরফিউস ও ইউরিডিসি, বুদ্ধদেব ও আম্রপালি...

স্বর্গ বুঝি আসল নেমে আবছা আলো ঘরের কোণে

না বলা কথা অনেক ছিল পড়ছে না যে কিছুই মনে।

হঠাৎ দেখি কাঁদছ তুমি, তোমার চোখে অশ্রুধারা

তোমার মুখে আমার ছায়া আনন্দেতে বাক্যহারা।

সুদীপ্ত বিশ্বাস,কবিতা লিখছেন ১৯৯২ সাল থেকে । কবিতার প্রথম প্রকাশ ২০১০ সালে। কবির কবিতা প্রকাশিত হয়েছে শুকতারা, নবকল্লোল, উদ্বোধন, কবিসম্মেলন, চির সবুজ লেখা, তথ্যকেন্দ্র, প্রসাদ, দৃষ্টান্ত, গণশক্তি ইত্যাদি বাণিজ্যিক পত্রিকা ও অজস্র লিটিল ম্যাগাজিনে। কবিতার আবৃত্তি হয়েছে আকাশবাণী কলকাতা রেডিওতে। ঝিনুক জীবন কবির প্রথম বই। ২০১০ এ প্রকাশিত হয়। এরপর মেঘের মেয়ে, ছড়ার দেশে, পানকৌড়ির ডুব, হৃদি ছুঁয়ে যায়, Oyster Life বইগুলো এক এক করে প্রকাশিত হয়েছে। দিগন্তপ্রিয় নামে একটা পত্রিকা সম্পাদনা করেন। কবি পেশাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। নদিয়া জেলার রানাঘাটের বাসিন্দা। শিক্ষাগত যোগ্যতা বি ই,এম বি এ, ইউ জি সি নেট। স্বরবৃত্ত, অক্ষরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত তিন ছন্দেই কবিতা লেখেন।বড়দের কবিতার পাশাপাশি ছোটদের জন্যও কবিতা লেখেন।

নতুন ভাষায়

প্রণব বসুরায়

আগুন স্বাক্ষর দিলে কবিতা পাতায়

টাকলামাকান পেরিয়ে উড়ে এল দূরপাখি

আর সেই মুহূর্তে প্রতিমায় আঁকা হল

তৃতীয় নয়ন

#

একটা নৌকো ভাসিয়ে দিলাম গাঙুরের জলে

সঙ্গে দিলাম ফল, মধু আর একটি নিশান

সে দুলে দুলে চলে যাক তোমাদের দেশে

#

আমাদের কথা হবে নতুন ভাষায়

আমাদের কথা হবে কবিতা-ভাষায়

আমাদের কথা হোক বাংলা ভাষায়

ক্ষমা চাই

প্রণব বসুরায়

নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি পাখির কাছে

ফল ও গাছের কাছে... ফুলের কাছেও

আমি নতজানু পৃথিবীর কাছে

রোদ ও জ্যোৎস্না-- আমি কৃতজ্ঞ থাকলাম

ক্ষমা চাই সমস্ত ভুলের কাছে

তোমার কাছে -- গান্ডীব থেকে ছুঁড়ে দেওয়া তির

#

হ্যাঁ, তোমার কাছেও—

অসমাপ্ত ও যাবতীয় ব্যর্থ কবিতা আমার...

কোলাজ

প্রণব বসুরায়

একটা ছোট্ট শব্দ করে ফোন কেটে যায়

বুঝছি, এ সবই তোমার কারসাজি।

কানামাছি খেলতে খেলতে যাকে ছুঁয়েছিলে

চোখ খুলে তাকেই ডেকেছো অচেনা মেলায়...

চাঁদ তখন বাতাবি লেবু ও কাঠের টুকরোয়

খেলাঘর তৈরির ঘোরে,

বিদ্যুৎ মাঝ আকাশে থমকে দাঁড়িয়ে

*

রূপোলী চাদর সরিয়ে তুমি দ্যাখালে

এ্যাকোয়ারিয়ম, ও হাতির দাম্পত্য

দমকলের ঘন্টায় কিভাবে বিপদের সূচনা হয়

শেখালে তাও

*

এ সব জুড়ে জুড়েই একটা দৃশ্যকল্প

এ সব জুড়ে জুড়েই একটা কোলাজ...

প্রণব বসুরয়ের লেখালিখির শুরু স্কুলের শেষ ধাপে। কবিতা প্রথম মুদ্রিত হয় ১৯৬৪ সালে।নামী, দামী ও প্রচুর লিটল ম্যাগে লিখেছেন। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ‘প্রণয়রাঙ্গতা’, ‘এ বাড়িতে রান্নাঘর নেই’ ও ‘ফ্রেডরিক নগরের বাসিন্দা’।সম্পাদিত কাব্যসংকলন ‘শীর্ষবিন্দু—কবিতার ৫০ বছর’ সদ্য প্রকাশিত। অবসর গ্রহণের পর কবিতাই প্রধান উপজীব্য।

নুপুর রায়চৌধুরী

১

এই আকাশেও কালো মেঘের ধুম্রজাল
গুরুগুরু ডম্বরু ভ্রূকুটি হানে ভয়াল
মাতাল হাওয়ায় প্রেয়সী বনানী বেহাল
বৃষ্টির সজল কাজল সিক্তমদির আলিঙ্গন
পেলব কংক্রিটের সড়কে আঁকে সঘন চুম্বন
সবইতো এক

তবু কেন এত দুর্বার অভিমান?
অতলান্তিকের বাতাসে কোথা
পাবে সেই সোঁদা মাটির আঘ্রাণ?
খুঁজে পেলে বুঝি
হিজলের বাহুবন্ধনে মাধবীলতা ম্রিয়মান?
নাহ এইত বেশ
চেনা বাঁশি তুলির রূপটান সব মিলে মিশে একাকার
স্মৃতিতেই কদমকিশোরের নিরন্তর দুরন্ত অভিসার

২এই নির্জন সন্ধ্যাগুলো
আমার খুব একা লাগে
চেয়ে চেয়ে দেখি
মহীরুহের সীমন্ত লেপ্টে
সূর্যের শেষ রক্তবিন্দুর মায়া
ভবঘুরেগুলো দূরপাড়ি দেয়
রাতের আস্তানার খোঁজে
জঙ্গলে ক্লান্তির ঘুম নামে
অর্থহীন শব্দেরা আমায় ঘিরে
কেমন ফিসফিস করে
আমি খুঁজি ওদের উৎস

অলিন্দে না করোটিতে?
বুঝতে পারিনা ধাঁধা লাগে
টেনে নিয়ে চলে যেতে চায়
পাকদন্ডীর ফেলে আসা
কদাকার পিচ্ছিল পথে
আমি তীব্র প্রতিবাদ করি
যুক্তির বেড়াজাল বাঁধি
মাটি আঁকড়ে রক্ষাগন্ডি কাটি
হিসহিস করে ওদের উদ্যত ফণা
প্রচন্ড নিস্ফলতায়
বারংবার বারংবার
শ্রান্ত আমি ঘুমাবো এখন
চোখে এঁকে ভোরের স্বপন

৩

ঘুমন্ত পাহাড়ে তুষার ঝরছে

পেঁজা তুলোর মতো দুধ সাদা

মসৃণ আর হিমশীতল

আমার ইচ্ছা করে ওখানে

পা টিপে টিপে উঠে যেতে

একটাও যদি সবুজ কুঁড়ির দেখা মেলে

আলতো করে গাল ঠেকাবো একবার

আর পাদদেশে ওই যে নিষ্পত্র বনভূমি

খুঁজে পাবো কি একটা রোডোডেন্ড্রনের

রক্তস্তবক?

উন্মুক্ত কবরী ঢেলে সাজবে লালে লাল

হয়তো এ সব ই আছে কিংবা নেই

এই পরিবর্তনভূমিতে

কিন্তু ইচ্ছেঘোড়া মনপবনের নাও

সেগুলো আছে কি করতে?

দুরন্ত তুলির বানভাসি রংএই ক্যানভাসে

ফণিমনসায় রক্তকুসুম আগের মতোই হাসে

নুপুর রায়চৌধুরীর, জন্ম, পড়াশুনো দেশে। বোস ইনস্টিটিউট থেকে ডক্টরেট করে বিশ্বভারতীতে শিক্ষকতা করেছেন। লেখালিখির নেশা. মিশিগানের বাসিন্দা।

সম্বল

মলয় সরকার

তুমি আসবে বলে চেয়েছিলাম সাঁঝ আকাশের দিকে-
তখন আকাশ রঙ ধরেছে সবে
একটু নীল একটু লাল একটু হলুদ ফিকে

চেয়ে চেয়ে কখন সময় পেরিয়ে গেছে চলে-
চোখের থেকে টুসিয়ে পড়ে
একটি ফোঁটা গরম লোনা জল,
তখন তুমি অনেক দূরে-
নীল সাগরের সুদূর পারে,
আমার তখন তোমার ডানার
শব্দই সম্বল।

এবার চলেছি আমি

মলয় সরকার

অনেক ঘুরেছি আমি
সভায় সমিতিতে হোটেল রেস্তোঁরায়
সুউচ্চ প্রাসাদ কিংবা হর্ম্ম্যমালায়
অনেক শুনেছি আমি
বড় বড় কথা- আশা নিরাশায় গাঁথা,
অনেক শুনেছি বাণী

ধুত্তোর! ভাল লাগে না আর কিছু
এবার চলেছি আমি
যত ক্ষেতে খামারে আর নীচু
মানুষের কাছে।

যেখানে ধোঁয়া ওঠা চায়ের কাপ কিংবা
গরম কিছু পানীয়ের বদলে
তাজা ফুলের সুবাস ভরা
অন্ততঃ কিছু প্রাণ আছে।

ভাঙা বাড়ি

মলয় সরকার

কবে প্রোমোটার আসে ঠিক নেই

ছিঁড়ে ফেলে দেবে অস্তিত্বের প্রাচীন শিকড়।

ভয় হয়, বড় ভয় হয়

বহুদিন চলে গেছে সব-

সব স্মৃতি ঠেলে ফেলে রেখে,

বাকী সব মরে হেজে গেছে।

শুধু এক দৃঢ় বটগাছ ধীরে ধীরে মেলে ডানা

প্রাচীরে আমার, কি এক নতুন আশ্বাসে,

আকাশের সাথে কোলাকুলি বুঝি সাধ তার

অন্ধকার চারিদিক পূজার দালানে

বাসা শুধু চামচিকে বাদুড়ের।

আমি শুধু একা শুনি ঘন্টা-শংখধ্বনি

চিৎকার হুড়োহুড়ি কচি ছেলেদের

স্মৃতির আঁধার খাতায়

আজ মনে হয় বার্ধক্যের এই আলসেতে

রংগিন বেগুনী শাড়ি যদি মেলে দেয় কেউ-

অপেক্ষা

মলয় সরকার

শহর জুড়ে সেদিন বৃষ্টির তাণ্ডব

ভেংগে পড়েছে গাছ,

আটকে গেছে তোমার গাড়ি,

আমার একফালি বারান্দায়

শুধু ঘর বার করি আর চিন্তায় মরি।

ফুলে ভরা কদমগাছ

জ্বলছে ধকধক করে,

মেঘেরা বাষ্পের আড়ালে আমাকে ঢাকে,

আমি সেইসব ভিড়ের জংগল,

ছিঁড়ে ফেলে

আপনমনে,

কিছু ঝরা পাতার নৌকো ভাসাই

আমার চোখের জলে।

আয়নায়

মলয় সরকার

আয়নায় নিজের মুখ দেখেছি

কিন্তু নিজেকে চিনেছি কই?

যতবার দেখি মনে হয়

এতো আমি নয়, নিশ্চয় তবে

নিশ্চয় এ আমার সই।

মলয় সরকার বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক ম্যানেজার। লেখালিখি অনেক দিনই। পড়াশোনা খড়্গপুর আই আই টি থেকে রসায়নে স্নাতকোত্তর, ব্যাঙ্কে সি এ আই আই বি। জ্ঞান-বিজ্ঞান এর মত বিজ্ঞান পত্রিকা থেকে শুরু করে বাংলায় একমাত্র অনুবাদ পত্রিকা- 'অনুবাদ পত্রিকা',এছাড়া অক্ষরপ্রয়াস , মাসকাবারী, পরবাস, ইসামন ইত্যাদি ও অন্যনিষাদ, প্রতিলিপি ইত্যদি নানা ই- ম্যাগাজিনে লেখা লিখিতেই আপাততঃ সময় কাটে। এ ছাড়া একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থায় জড়িত , যেখানে এক শতা্ধিক ছাত্র ছাত্রীকে বিনা পয়সায় লেখা পড়ার ব্যবস্থা করা হয় ইত্যাদি।

বর্তমানে স্বগৃহ উঃ ২৪ পরগণার সোদপুরে স্থিতি। শখ ভ্রমণ দেশে ও বিদেশে এবং গাছ-পালার চর্চা

স্বপ্নিলা দাশ

দুই কন্যার জননী স্বপ্নিলা, আপস্টেট নিউইয়র্কের মানিলাস নামে একটি ছোট্ট শহরের বাসিন্দা। স্বপ্নিলা ইনটেরিয়র ডিজাইনের বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করেছেন। চিত্রাঙ্কন ছাড়াও স্বপ্নিলার অন্যান্য আগ্রহের বিষয়গুলি হচ্ছে - উদ্যানপালন, ভ্রমন, এবং রন্ধনশিল্পে।

সরা পেইন্টিং

সৌরভ ঘোষ

শিল্পী সৌরভ ঘোষ শান্তিনিকেতনের কলাভবন থেকে মাস্টার্স ইন ফাইন আর্টসের ডিগ্রিধারী। পিতা ননি গোপাল ঘোষ কলাভবনের শিক্ষক ছিলেন। সৌরভ অল্প বয়স থেকেই শিল্পী সুলভ বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে থাকেন আনুষ্ঠানিকভাবে শিল্প বিভাগের ছাত্র হন এবং পরে ইউনিয়ন একাডেমী, এবং নৈনিতালের শের-উডে শিক্ষকতা করেন। বর্তমানে সৌরভ একজন ফ্রি-ল্যান্স শিল্পী। সৌরভ আলপনা, স্টেজ ডিজাইন, ফটক ডিজাইন , এবং সরা চিত্রকলাতে পারদর্শিতার পরিচয় দিয়ে কোলকাতার বর্তমান শিল্প সমাজে নিজস্ব শিল্প কুশলতার জন্য স্বীকৃতি পেয়েছেন।

অঙ্কন: প্রিয়াঙ্কা বিশ্বাস

প্রিয়াঙ্কা বিশ্বাস একজন জাত শিল্পী,, উৎসাহী হাইকার, এবং আলোকচিত্রকর। বর্তমানে ডেনভার শহরে হেল্থকেয়ার বিভাগে কর্মরত। বর্তমান পেইন্টিংটি প্রিয়াঙ্কার মিডল স্কুলে পড়বার সময়কার আঁকা।

অঙ্কন

দীপা দাশগুপ্তা

দীপা দাশগুপ্তা নিউ ইয়র্ক স্টেটের ইউটিকা শহরে স্বামি অর্ণব এবং পুত্র অর্পনের সঙ্গে বাস করেন ২০০২ সাল থেকে ।ছবিআঁকা দীপার বিশেষ ভালবাসার কাজ । দীপা জল রং, তেল রং ও এক্রিয়ালিক রঙের মাধ্যমে ছবি আঁকেন ।দীপা অল ইণ্ডিয়া আর্ট প্রতিযোগিতায় বহু পুরস্কার পেয়েছেন।

অঙ্কন

অমৃতা ব্যানার্জি

দুরে কোথায়

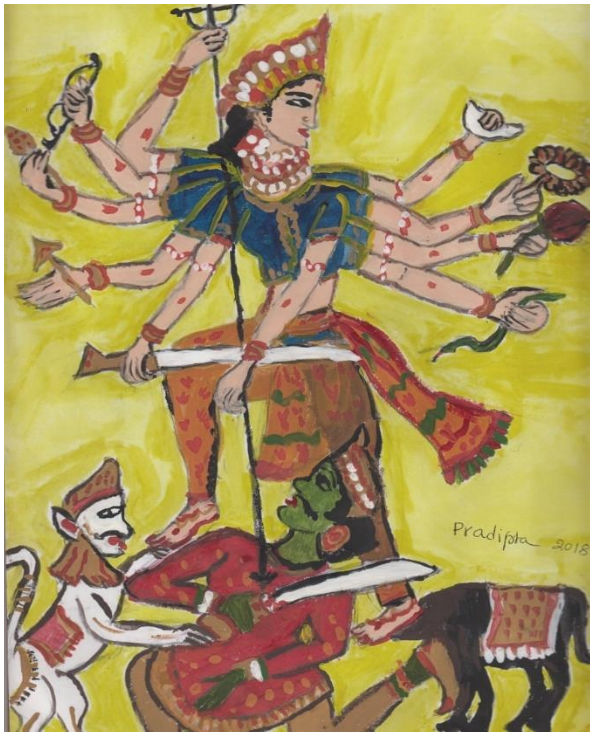

অঙ্কন

প্রদীপ্তা চ্যাটার্জি

মহিষাসুররমর্দিনী

অঙ্কন দীপা দাশগুপ্তা

আলপনা

ভাস্বতী বিশ্বাস

কোলকাতা নিবাসী অমৃতা ব্যানার্জি জল ও তেল রঙের মাধ্যমে ছবি আঁকেন।

অঙ্কন

অমৃতা ব্যানার্জি

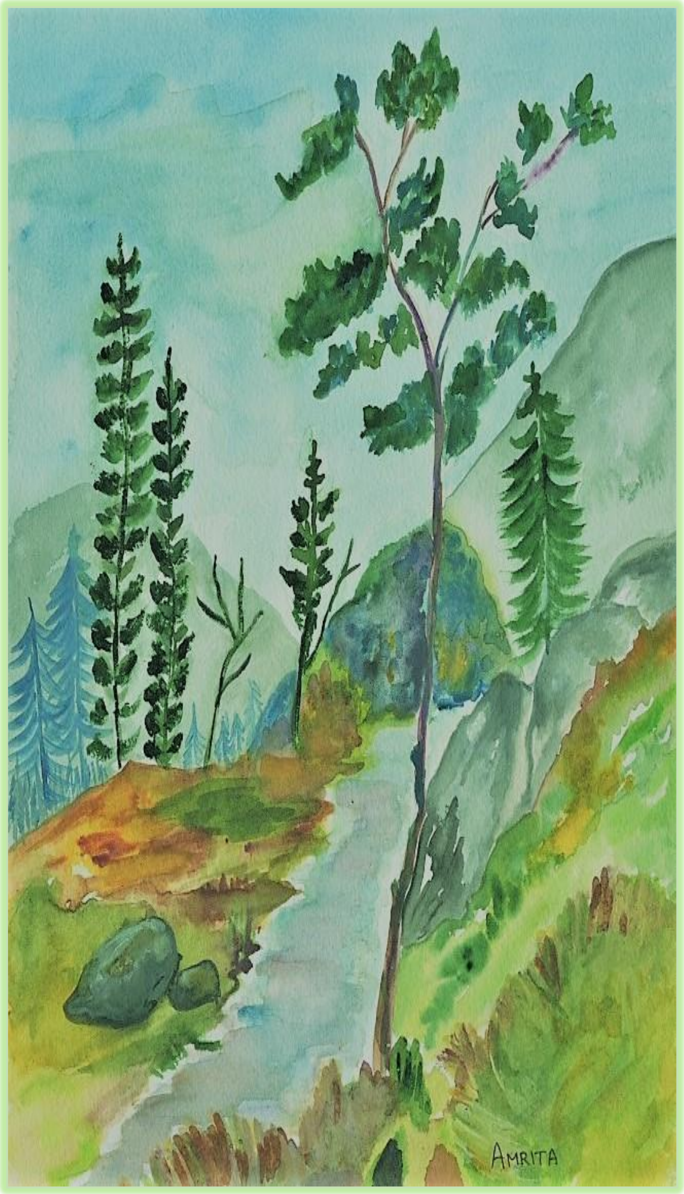

‘ফুলের জলসায়’

সীমা রায়চৌধুরী

সীমা রায়চৌধুরী পড়াশুনা করেছেন ভারত বর্ষে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। সীমা দুই দশক ধরে গ্লোবাল টাঙ্গস্টেন নামক একটি সংস্থাতে প্রিন্সিপ্যাল সায়েন্টিস্ট এর পদে কর্মরত ছিলেন। সম্প্রতি অবসর নিয়ে বিশেষ ভালবাসার জিনিস নিজস্ব ফুলবাগানে ফুলগাছের পরিচর্যায় ব্যস্ত।

পুজোর গন্ধ

দেবায়ন চৌধুরী

তর্পণ

শরত এলে আমার কাছের মানুষদের কথা মনে পড়ে। যারা কেবল স্মৃতিতে জীবিত। কয়েক বছর হয়েছে। পুজোর ঠিক আগে চলে গেলেন বোবাদাদু। বাবার কাকা। বিয়ে থা করেননি। আমার ঠাম্মাকে মা ডাকতেন। পুজোর পঞ্চপ্রদীপ কাছে এলে আমাদের কাছে তাপ নিতেন। ঠাকুর প্রণাম করতে করতে বলতেন- ভালো। ভালো। ভ- এর উচ্চারণ ব এর মতো শোনাত।
জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মাথার সামনে জ্যোতি বসুর ছবি ছিল। বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়ন করতেন। ইন্দিরা গান্ধীর ছবি দেখলে রেগে যেতেন। জরুরি অবস্থার সময় কি দুর্ভোগ তাকে পোহাতে হয়েছিল, আমার সঠিক জানা নেই।
মায়ের কাছে শোনা আমি যখন আসব আসব করছি, মা ভাত বসিয়ে দেবার পর দাদু অপেক্ষা করতেন একান্নবর্তী পরিবারের বড় হাঁড়ি উনুন থেকে নামিয়ে দেবার জন্য।
হুট করে ঘুমের মধ্যে দাদু ঘুমের দেশে। পাড়ার লোক এসে বললেন- ওনার যাওয়া দেখলে হিংসে হয়। আমরা খুব বেশি কান্নাকাটি করিনি।
নদীর পাশে কাশফুল। শ্মশানে ভাত ফুটছে। শরতের রোদ নিজেই আগলে রাখছে দেহটিকে।
আমি ভেবে যাচ্ছি দাদু আর নাতির গল্পে কীভাবে গরম ভাতের গন্ধ মিশে থাকে!

বসে আছি পথ চেয়ে

আমরা অপেক্ষা করতাম কবে দুর্গাপূজা আসবে, আমাদের নতুন জামাপ্যান্ট হবে। জন্মদিন কিংবা পয়লা বৈশাখে একটি গেঞ্জি বা হাফপ্যান্ট। রাসমেলা থেকে সোয়েটার কেনা হত। ছোট সোয়েটারগুলোর ওপর বাড়িতে ফুল শার্ট পরতাম। আমরা অপেক্ষা করতাম রবিবারে মাংস হবে। অপেক্ষা করতাম কবে বরযাত্রীর নেমন্তন্ন পাব। টিফিনে কচুরি, তিন রকম মিষ্টি। অপেক্ষা করতাম বাড়িতে কবে অতিথি আসবে। হাত থেকে বাসন পড়ে গেলে কিংবা কুটুম পাখি ডাকলে ভাবতাম… বাবা স্কুল থেকে ফেরার সময় রোজ একটা সন্দেশ নিয়ে আসতো খুব ছোটবেলায়। রামভোলা স্কুলে, উচ্চমাধ্যমিকের মেন সেন্টার হলে নিউ কোচবিহার স্টেশন থেকে খাতা দিয়ে ফেরার সময় বাবা ধোসা নিয়ে আসতো। রাত হলেও জেগে থাকতাম। পরীক্ষা আর কতদিন চলবে বাবা…

অপেক্ষা করতাম আমাদের একটা নিজের বাড়ি হবে। আসলে বাড়ির ঠিকানা বলে তারপর বলতে হয়তো আমরা ভাড়া থাকি। প্রথম প্রথম যে পাড়ায় যাই খেলায় নিতে চায় না। পরে খুব ভাব হয়ে যায়। তখন আবার ছেড়ে আসতে কষ্ট হয়। আমরা অপেক্ষা করতাম কবে বাবা বাড়ি করবে, বর্ষাকালে আমি ইচ্ছে মতো দিনের বেলায় লাইট জ্বালাবো, কেউ কিচ্ছু বলবে না। মা প্রচুর জল খরচ করবে অনেক সময় ধরে, কেউ তাড়া দেবে না।

আমরা অপেক্ষা করতাম আমাদের সাদা কালো টিভিটা রঙিন হয়ে যাবে। কেবল লাইন নেবো। আমাদের বন্ধুদের দল রোটেশন পদ্ধতিতে সাহারা কাপ দেখেছি। পাড়ায় সব বাড়িতে ফোন, টিভি নেই। নেই আনন্দবাজারও। আমরা অপেক্ষা করতাম দুটো করে পেপার রাখবো একদিন। প্লেয়ারদের ছবির খাতা করবো। রাস্তায় যেতে যেতে প্রিয় গান শুনলে থেমে যাই। আমরা অপেক্ষা শিখেছি। সেকেন্ড ধরে নয় ,গান আগুপিছু হয় হাতযশে… ক্যাসেটের ভেতর পেন নিয়ে ঘোরালে সুদর্শন চক্র…

আমাদের অপেক্ষারা গরমের ছুটিতে মামাবাড়ি ঘুরতে যায়। রথের মেলায় মাটির পুতুল কিনতে চায়। জন্মাষ্টমীতে চাক কেটে পাহাড় করব বলে সারা বছর ভাবতে থাকি। আমাদের ভাবনারা বইমেলার অপেক্ষা করে। এই মফস্বল শহরে বইয়ের দোকানে খুব বেশি বই থাকে না টেক্সট বুক ছাড়া। লালু বন্ধু হয়ে ওঠে। রামের সুমতি হয়। বইয়ের মলাট লাগানোর জন্য পুরনো ক্যালেন্ডারের খোঁজ করতে থাকি।

মা চাকরি করতো না বলে মাঝে মাঝেই অনুশোচনায় ভুগতো। সে সব মুহূর্তে আমি বড়ো হবার অপেক্ষা করতাম। বড়ো হওয়া মানে গোটা হাঁসের ডিম, গোটা রেলের টিকিট, রাতে একা ঘুমোতে পারা, চাঁদার রসিদে নিজের নাম। মায়ের জন্য একসঙ্গে অনেকগুলো শাড়ি কেনার সঙ্গতি আর বাবার হাতে শ্যামল বিড়ির বদলে দামি সিগারেট।

আসছে বছর আবার হবে– দশমীর রাতে ট্র্যাকে করে ফেরে আমাদের শৈশব। কাল থেকে বাড়িতে নাড়ু, মোয়া বানানো শুরু হবে। এবারে লক্ষ্মী পুজোর দিন প্লাস্টিক নিয়ে বেরবো। সকালে পড়তে বসে অল্প অল্প করে…

বড়ো হবার অপেক্ষা খাতায় দুর্গানাম লিখতে থাকে। মা বলেছে একদিন দেখবি আমাদের কোনও কষ্ট থাকবে না। লক্ষ্মীর চাল কলা মুখে পুরে হাতটা মাথায় মুছে নেওয়ার সময় ভাবিনি জীবনের অপেক্ষারাই আসলে জীবন হয়ে থাকে!

পুজোর গান

কে বলে ঠাকুমা তোমার বয়স পেরিয়ে গেছে আশি…আমার ছোটবেলার প্রিয় গান। দরজা খুইল্যা দেখুম যারে… দরজা খুললেই বাবুল নিতাই কুলপি মালাই। হরেকমাল। ব্যোম পুলিশের আইসক্রিম। ঘরের ভেতর পরম যত্নে রাখা পুজোর রসিদ। কাঠের বাক্সে জমিয়ে রাখি। না, সে বাক্সে ন্যাপথালিন ছিল না।

মুক্কালা মুকাবিলা কিংবা তুরুক তুরুকধুম গানের সঙ্গে দশমীর উত্তাল নাচ আমাদের। ঠাকুর যাবার আগে দেখে নেন আমরা কে শক্তিমান, প্রভু দেবা। অসুরের মুখে লেগে থাকা সন্দেশ খেয়ে ফেলেছি অনেকক্ষণ।

পুজো মানে পুজোর গান। মহালয়ার পরে আহুজার দোকানে রোজ টইটই। নতুন গান বাজাতেই হবে প্যান্ডেলে। ক্লাবের কি মান সম্মান নেই! ক্যাসেটের পিঠ উল্টে দেবার অপেক্ষাতেই আমাদের উত্তেজনা। জ্যাকেটের ভেতর খুদে অক্ষরগুলো কতবার যে পড়তাম, গোটা গান থাকলে তো কথাই নেই। x= প্রেম ধরে নিয়েই আমাদের বয়ঃসন্ধির অঙ্ক। তোমার দেখা নাই বলতে বলতে মাধ্যমিক পরীক্ষা। কভি খুশি কভি গম… অন্ত্যক্ষরী পুজোর আড্ডায়।

ষষ্ঠীর সন্ধে থেকেই এক পাড়া থেকে অন্য পাড়ায় প্রবেশের ব্যাপারটা ভারি মজার। দুটো গান ভেসে আসছে। মিশে যাচ্ছে। বোস পিসিও-র সামনে তেমাথায় তিনটি গান মিলে যাচ্ছে। বাজার ব্যাগে জিওল মাছ। লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে যে!

রাস্তায় লাগানো চোং –গুলো মাঝেমধ্যেই বিগড়ে যায়। আমরা শম্ভু মাইক সাপ্লাই-এ গিয়ে বলি, আবার গান হাওয়ায়—ঐ যে আকাশের গায় দূরের বলাকা ভেসে যায়…

আমরা কেউ আর প্রিয় গান শুনলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে যাই না। মোবাইল আছে যে! আমাদের চলে যাওয়া দিন পুজো প্যান্ডেলে পছন্দের গান শুনে নাচতে থাকে। সর্ব দেহে মনে। ক্যারামের গুটি পকেটের কাছে গিয়ে থেমে যায়। রেড কনফার্ম হয়ে ওঠে না আর।

মা দুর্গা হাসতে থাকেন।

ঢাক বাজে।

নামগন্ধ

উপোসের কথা শুনলেই আমার খিদে পেয়ে যায়। তাই অষ্টমীর সকালে স্নান করেই আমার মন আনচান করতে থাকে। কালীপদ জ্যেঠুর দোকানে ভোগের সন্দেশ আনতে গিয়ে জুলজুল করে পরোটার দিকে চেয়ে থাকি। ক্যারামে পরোটা আর শুকনো তরকারি বাজি রেখে খেলে অনেকেই। আমরা যারা প্রতিবছর সরস্বতী পুজোর আগে কুল খেয়ে বলেছি ঠাকুর রাগ কোরো না, তারা অষ্টমীর অঞ্জলি দিতে দিতে মিষ্টির প্যাকেটের দিকে চেয়ে থাকবে রাগে অনুরাগে, সেটাই স্বাভাবিক।

দূর্গাবাড়িতে পাত পেতে বসেছিলাম একবার। বড়বেলায় নারায়ণ হয়ে সেবা নিতে লজ্জা লাগতো। তবে ঠাকুর দেখতে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খিচুড়ি খেতে ভালো লাগে। গরমাগরম বস্তুদের ফু দিয়ে জিভের ডগায় নিতে নিতে কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। আঙুল চাটতে চাটতে জলের খোঁজ। বেলুন নিয়ে এই মাত্র চলে যাচ্ছে যেই লোকটি, আমি তার ডাকনাম জানি।

সপ্তমীতে প্রথম দেখা, অষ্টমীতে হাসি… আমরা বিশ্বাস করেছিলাম ঠাণ্ডা পানীয় সম্পর্ক গড়ে দেয়। দেয় বইকি। তবে তা বিজ্ঞাপনের মত নয়। মিতালিতে মোগলাই খেতে খেতে অনুভব করতাম প্রজাপতিরা উড়ে যেতেই আসে! পরোটার সঙ্গে দুবার তরকারি না দেবার অমলিন দুঃখে দোতলা থেকে পথে নামি।

রাতে বিশেষ খিদে পায় না। তবু ভালো খাবারের লোভে পাতে বসি। মা ভোগের প্রসাদ দেয়। ফুল লেগে আছে। অদ্ভুত একটা গন্ধ পাই। মায়ের গন্ধ। পুজোর গন্ধ।

~~~

দেবায়ন চৌধুরীর জন্ম, আসামের তেজপুরে। বড়ো হয়ে ওঠা পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহারে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতকোত্তর। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগে উত্তরবঙ্গের উপন্যাস বিষয়ে গবেষণারত। সহকারী অধ্যাপক- শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরা গভর্নমেন্ট কলেজ ফর উইমেন, পূর্ব মেদিনীপুর। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত গদ্য, প্রবন্ধ লেখালেখি। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ- যা কিছু আজ ব্যক্তিগত, সম্পাদিত গ্রন্থ- দুর্গামঙ্গল।
~~~

আর্যা ভট্টাচার্য

আভাস

রা কোটালের জলে

ষাঁড়াষাঁড়ি বান ডাকা

তীব্র আকর্ষণ।

মোমাজির রঙে ঝরা

বিন্দু বিন্দু হৃদয় ক্ষরণ।

শরীরের গুপী যন্ত্রে

সু-আর্ত চিৎকার;-

তার সাধা নিকো ছিঁড়ে

আকুল বিকুল-

নষ্ট পাট।

তোকে চেয়ে আছড়ায়

নেতা ধোপানীর ঘাটে -

তীব্র দিন-অতি দীর্ঘ রাত।

মুখ সব

মিলে যায়-মিশে যায়-

জল রঙা ছবি হয়;-

সর্বনাম হয়ে থাকে ভালোবাসা-

প্রেমে লাল

ছায়া ছায়া মুখের আভাস

অপেক্ষা

কৃষ্ণা পঞ্চমীর চাঁদ আলস্যে রয়েছে শুয়ে

ঝাউ-বন ঘিরে।পুবের বাতাস ছোঁওয়া-

বিন্দু বিন্দু বর্ষণের সুখ: অর্ধ

চৈতন্যের ঘোর হৃদয়ে লেগেছে।

-ভালোবাসি- বলো এইবার!

হঠাৎ বিদ্যুৎ ছোঁয়া আমূল কাঁপিয়ে দিক,

ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে অপেক্ষার রাত।

অন্ধ চোখে-স্পর্শে দেখি- কোন আকর্ষণ-

শ্রীমতীকে ঘরছাড়া করেছে ভীষণ

স্মৃতির গন্ধ

তোমার স্মৃতির গন্ধ শ্বাসের

গভীরে যায়,

নিঃশব্দ আক্রমণে রক্তস্তব্ধ

করে আনে-সমস্ত চিন্তার।

রাতভোর নেশাতুর চাঁদের

আলোর সাথে খেলা করি।

রহস্য মাখানো কত গল্পকথা

চাঁদ বলে যায়।

যে চাঁদের খোলা চুলে

তুমি থাক

আভাসে ইংগিতে।

শ্রীমতী আর্য্যা ভট্টাচার্য দর্শন শাস্ত্রে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচডি করেছেন, এবং কোলকাতার বিবেকানন্দ কলেজের (মহিলাদের জন্য) দর্শন বিভাগের প্রধান ছিলেন।
পরবাস, আবোহোমান, এবং পূর্বপশ্চিম নামক পত্রিকায় আর্য্যা ভট্টাচার্যের কবিতা প্রকাশিত হয়েছে।
কবিতা এবং বিশ্ব ভ্রমণে তাঁর গভীর আগ্রহ।

“মধুর তোমার শেষ যে নাহি পাই”-
।। জীবনে সম্পর্কের ওঠাপড়া ।।

লিলি বন্দোপাধ্যায়

হঠাৎ ই মনে হ’ল জীবনের এমন একটা বয়েসে পৌঁছে গিয়েছি , যখন ইহলোকের সঙ্গে সম্পর্ক যে কোন দিন থেমে যেতে পারে। তখন ভাবনায় এলো কত রকমের সম্পর্কের বন্ধনে এই জীবন হেসেছে, কেঁদেছে, কাছে গেছে, দূরে সরেও গেছে।

পারিবারিক সম্পর্কের বাইরেও অসংখ্য সম্পর্ক বন্ধনে বাঁধা পড়েও জীবন এতখানি পর্যন্ত এগিয়ে এলো।

পারিবারিক সম্পর্কের শুরুতে ট্র্যাজেডি, আমার চার বছর বয়সে বাবার চলে যাওয়া। তাঁর সম্পর্কে আমার স্মৃতি তাই ঝাপসা। বৃষ্টির সময় গাড়ির কাঁচের ভেতর দিয়ে যে বাইরে দেখা যায় –তার মতই। তবু বাবার একটা স্পষ্ট ছবি আছে আমার মনে –মার মুখে প্রতিদিনকার অজস্র ঘটনা শুনে আর অনেক অনেক ফটোগ্রাফ দেখে। খুব শৌখিন, সরল মানুষ ছিলেন। শুধু মার গান শুনেই মার সঙ্গে বিয়ে হয় তাঁর। মার গানের গলা ছিল অসম্ভব সুরেলা—রাগপ্রধান-রবীন্দ্রসংগীত থেকে কীর্তন পর্যন্ত সবেতেই তাঁর সুরের গতি ছিল স্বচ্ছন্দ। শুনেছি বাবার প্রিয় রবীন্দ্রসংগীত ছিল –‘আমি কান পেতে রই –আপন হৃদয়-গহন মাঝে—“ এবং ‘সঘন-গহন রাত্রি ঝরিছে শ্রাবণধারা’ ।

মা, বাবা, ঠাকুমা তখন থাকতেন রসারোডে। পূর্ণ বিজলী সিনেমাহলের মাঝখানে স্যাঙ্গুভেলির দুটো বাড়ি পরের বাড়িতে। বাবা অসম্ভব সিনেমা দেখতে ভাল বাসতেন। মাকে নিয়ে মেট্রো, লাইটহাউস, রক্সি—সব হলে মর্নিং শো থেকে নাইট শো কিছু বাদ দিতেন না , ছুটির দিনে। তখন সবই ইংরেজি সিনেমা। মা কথা বুঝতেই পারতেন না , তবু যেতেই হোতো। ‘হাঞ্চ ব্যাক অফ নোটারডাম’ এর গল্প মার মুখে শোনা। বাবার স্মৃতিচারণের ফাঁকে এসব গল্প শুনতাম আমার ছোটভাই আর আমি।

মাত্র তিরিশ বছর বয়সে বাবা মারা গেলেন। আমার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট জ্যাঠামশাই, বাবার নিজের দাদা , কোনরকম খোঁজই করলেন না। সম্পর্ক ! রক্তের সম্পর্ক!

আমাদের স্থায়ী আস্তানা হল ব্যারাকপুরে, মামা ও দিদিমার সঙ্গে মা আমাদের নিয়ে থাকতে লাগলেন এবং একটি স্কুলে গানের শিক্ষিকার কাজে জয়েন করলেন। মামা বাটা কম্পানিতে কাজ করতেন। বিয়ে করেন নি।

ব্যারাকপুরে থাকাকালীন মার স্মৃতি বড় গম্ভীর, বিষণ্ণ। মা একদম কথা বলতেন না। কাঁদতেন ও না। কারুর সঙ্গে মিশতেন না। চাপা ঠোঁটে বড় বড় চোখে চেয়ে থাকতেন আর নিজের কাজটুকু করতেন। দিদিমার হ’ল মহা অশান্তি। এই সময় এনাদের পাড়ায় এক মস্ত বাড়িতে থাকতেন সরোজ বোস নামে পাকানো গোঁফের জাঁদরেল চেহারার একজন এক্স মিলিটারির মানুষ। তাঁর স্ত্রী , দুই মেয়ে, দুই ছেলেকে নিয়ে। এই সরোজ বোস ও তাঁর স্ত্রী ক্রমে হয়ে উঠলেন আমাদের দাদুভাই ও দিদিভাই। সম্পর্ক ! রক্ত বহির্ভূত ! আমরা চারবছর ও দুই বছরের ভাইবোন তাঁদের আদরে শাসনে বড় হয়েছি। বুঝতেই পারিনি—এঁরা আমাদের কেউ ছিলেন না। কিন্তু অনেককিছু হয়ে উঠেছিলেন। সম্পর্কের নিবিড়তায়।

দিদিমা মাকে জোর করে ওখানে নিয়ে গিয়ে মার কাছাকাছি বয়েসের ওদের দুই মেয়ে মীরামাসি ও রেনুমাসির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। আর ওদের অসম্ভব আন্তরিকতায় শেষ পর্যন্ত মা ওদের বড়দিদির জায়গাটা কখন যে দখল করে বসেছিলেন , মা নিজেও জানতেন না।

দাদুভাই ছিলেন খুব মজলিসি মানুষ। প্রতি সন্ধ্যায় গানের আসর বসতো ওঁদের বাড়ি। দাদুভাই নিজে তবলা বাজাতেন, নির্মল দা ওঁদের বড়ছেলে সেতার বাজাতেন, ওঁদের ছোটমেয়ে গান করতেন—অতএব মাকেও গান করতে হ’ত। দাদুভাই এর তাগিদে মা শ্রীরামপুর গিয়ে, তখনকার দিনের ঠুংরির ওস্তাদ শ্রীরাজেন ব্যানার্জীর কাছে ক্লাসিকাল গান শিখতে শুরু করেন।

আমার বাবা মানুষ হয়েছিলেন তাঁর মামা শ্রীনীহারচন্দ্র চক্রবর্তীর কাছে। আমরা সারাজীবন ওনাকে দাদু আর ওনার স্ত্রীকে ঠাকুমা জ্ঞানে সন্মান করেছি –ভালবেসেছি। আমার বাবার মা মারা যাবার পর হরিশ মুখার্জী রোডের এই দাদুর বাড়িতে মা বাবা থাকতেন। এই দাদুর মতো পণ্ডিত ও দার্শনিক মানুষ জীবনে কমই দেখেছি। সংস্কৃত-ইংরাজী-বাংলায় তাঁর ছিল সমান দক্ষতা। এনার তিনজন ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ছিলেন বিধান রায়, প্রশান্ত মহলানাবিশ ও ত্রিগুণা সেন। দাদু ছিলেন ম্যাথামেটিকস্-এ ঈশান স্কলার।

এই দাদুই , বাবা মারা যাবার পর, মাকে নিজের আশ্রয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। মা ওনাকে প্রণাম করে বলেছিলেন—" আপনি তো মাথার ওপর সবসময় আছেনই জানি। আগে আমি একটু চেষ্টা করি আমার বিদ্যায় ছেলেমেয়ে দুটোকে মানুষ করার।" দাদু মার আত্মসন্মানবোধকে স্বীকার করে নিয়ে আর কছু বলেননি। তবে এঁদের বাড়িতে ছুটির সময় আমাদের যাতায়াত ছিল অবাধ।

গানকে সম্বল করে মার একক যাত্রার ফলে আমরা নির্দিষ্ট একটা পরিবারে আবদ্ধ না থেকে –" বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো, সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো" কথাগুলিকে আমাদের জীবনচর্যার মধ্যে পেয়েগিয়েছিলাম।

আমরা ছোট মা গান শেখাতে যাচ্ছেন , তাই প্রতিবেশী কত অনাত্মীয় আত্মীয়ের শাসন ওস্নেহ পেয়েছিলাম বলার নয়। সেই ছোট থেকেই বিচিত্র মানুষের মিছিল জীবনকে মুগ্ধ করেছিল।

ভুলতে পারি কি শান্তি দির কথা? ছোটবেলার প্রতিবেশী এই শান্তিলতা চক্রবর্তীর সঙ্গে সম্পর্ক সারা জীবন ধরে। অসম্ভব চারিত্রিক জোর ছিল, আর ছিলেন প্রতিবাদী স্বভাবের মানুষ। ছোটবেলায় দেখতাম শান্তিদি সন্ধ্যেবেলা ঠাকুরের আসনে প্রদীপ আর ধূপকাঠি জ্বেলে প্রনাম করতেন। কোন ঠাকুরের পূজো করেন শান্তিদি ? ওনার ঠাকুরের আসনে উঁকি দিয়ে দেখি রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দের দুটো ছবি পাশাপাশি বসানো। আমি ওই বয়সে একটু অবাক। ঠাকুরের আসনে শ্রীকৃষ্ণ বা মা কালীর ছবি দেখতেই অভ্যস্থ ছিলাম তো।

দাদাবাবু, মেয়ে মঞ্জু , আর ছেলে পিন্টু কে নিয়ে ছিল শান্তিদির মধ্যবিত্ত সুখী সংসার। ছেলেটি প্রতিবন্ধি , এই এক দুঃখ ছিল। মেয়ে মঞ্জু তখন বি এ পরীক্ষা দিয়েছে, দাদাবাবু মারা গেলেন। মেয়ে এখানে ওখানে ঘুরে কোন চাকরী না পেয়ে ভাইকে নিয়ে বাড়িতে ব্যাগ তৈরির কাজ করে দোকানে দোকানে বিক্রী করতো।

পনেরো দিনের মধ্যে আমার খবর না পেলে শান্তিদি মঞ্জুকে পাঠাতেন আমার খবর নিতে। অনাত্মীয়ের সঙ্গে ছোটবেলার সম্পর্ক কি এত গভীর হয়?

দেখতে দেখতে মঞ্জুর বয়স পঞ্চান্ন—ছা্পান্ন হ'ল। শান্তিদির বয়স চুরাশি। মাস দু আগে খবর পেলাম মঞ্জু মারা গেছে। কিডনীর রোগে। ওর ছোট্টবেলা থেকে সব ছবি মনে ভেসে উঠল। কিন্তু শান্তিদিকে এই বয়সে ফোন করে কি বলব ? আমি বড় হবার পর আমাকে খুব ভরসা করতেন বলে ফোনটা করতেই হল। ফোন ধরে শান্তিদি বললেন, -"মনজুর খবর জান?" বল্লাম 'হ্যাঁ'। বল্লেন, "খুকু তুমি তো জান অল্প বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথ আর বিবেকানন্দ আমার ঈশ্বর, আমার গুরু।তাই আমার সংবিধানে দুর্বলতা কথাটাকে আমি কোনদিন ঠাঁই দিইনি। আমি এক দিনও কাঁদিনি। তুমি একদিন এসো। আমার কিছু বলার ছিলনা। শুধু'আসব' বলে ফোন কেটে দিয়ে ভাবলাম আমরা রবীন্দ্রনাথ- বিবেকানন্দ নিয়ে এত আলোচনা করি, বই পড়ি, অথচ এই মানুষটি তাঁর সমস্ত সমস্ত সত্বায় যেভাবে এঁদের চরিত্রবলকে আত্মস্যাৎ করেছেন; আমি তো তার ধারে কাছেও নেই। কেউ নয়—এই শান্তিদির সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে আসে। এই সম্পর্কগুলি আমার জীবনের উজ্জ্বল পাথেয়।

আমি হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করেছিলাম ব্যরাকপুর গার্লস্ হাই স্কুল থেকে। সেখানে দুজন টীচারের আমি মুগ্ধ ভক্ত ছিলাম। কৃষ্ণাদি ও ছায়াদি। ক্লাসে কৃষ্ণাদি ছিলেন ভীষণ রাগী। ওনার ক্লাসে পড়া না করে কেউ উপস্থিত থাকবে ভাবাই যেত না। সেই কৃষ্ণাদিই ক্লাসের বাইরে আশ্চর্য্য স্নেহময়ী অভিভাবক। সত্যিকারের ছাত্রদরদী একজন শিক্ষিকা হিসাবে তিনি আমার মন জুড়ে আছেন।

ছায়াদি এর সম্পূর্ণ বিপরীত। ছায়ার মতোই ছিপছিপে শরীরে মুখে মৃদু হাসি নিয়ে খুব নিচু স্বরে কথা বলতেন। পড়াতেনও অসম্ভব ভাল। ওনার শান্ত নিবেদিত ভাবের জন্য ওনার ক্লাস একদম চুপ থাকত। ওনার সঙ্গে আমার চিঠির যোগাযোগ ছিল বহুকাল। শিক্ষিকা-ছাত্রীর অমল সম্পর্কে।

ব্যারাকপুর স্কুল থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজে। সেখানকার ছাত্রছাত্রীদের চলা-বলার স্মার্টনেস দেখে আমি মফস্বলিয়া তো একেবারে চকিত চমকিত ! কিন্তু আমার কলেজের দিনগুলি কেটেছিল আনন্দে। ভূদেব বাবু, ভবতোষ বাবু -অরুণবাবুর পড়ানোয় মুগ্ধ। প্রেসিডেন্সিতে অনার্সের পাঁচজন বন্ধুর সঙ্গেই সমান বন্ধুত্ব ছিল। একসঙ্গে গল্প, একসঙ্গে আড্ডা, একসঙ্গে রসিকতা। কেবল অফ্ পিরিয়ডে পার্বতী-মন্টু-মনিকা-মঞ্জুলারা যখন কফি হাউসে চলে যেত , আমি একা হয়ে পড়ে লাইব্রেরীতে রিডিংরুমে বই নিয়ে কাটাতাম।

সেইখানে পেয়ে গেলাম কলেজের দুজন সটাফকে –নিজের সহোদর দাদার মতো। লাইব্রেরিয়ান প্রবোধদা ও অফিসের দিলীপদা। একেবারে ফ্যামিলিমেম্বার হয়ে গেলেন ওঁরা। বাড়ির গাড়িতে প্রবোধদাকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে যাওয়া , সেখানে প্রবোধদা দেখা করতে গেলেন অশীনবাবু, ভবতোষবাবু, ভূদেববাবুর সঙ্গে। আমারও দেখা হয়ে গেল আমার শিক্ষাগুরুদের সঙ্গে।

প্রবোধদা সমস্ত ছাত্রছা্রিদের নিজের নামে বই দিতেন , যাকে যতটুকু পারেন সাহায্য করতেন। --মাত্র বাহান্ন বছর বয়সে কোলনের ক্যানসারে প্রবোধদা চলে গেলেন।

দিলীপদা আজও অ্যালামনি এ্যাসোসিয়েসানের প্রাণপুরুষ। দিলীপদা আমার বি-এ, এম-এর সার্টিফিকেট রিসিভ করেছেন, আমি দিল্লী ছিলাম বলে। দুই মেয়ের বিয়েতে এসেছেন। আজও মাসে একবার দিলীপদার সঙ্গে দেখা করি। প্রতি সপ্তাহে ফোন করি –নানা কথা হয়। আশি পেরিয়ে গেছেন, প্রায়ই অসুস্থ হন। তবু কলৈজে যান। একটা মানুষ শুধু তার ট্রান্সপ্যরেন্ট চরিত্র ও ব্যবহারের আন্তরিকতায় যে কিভাবে সকলের হৃদয়ে জায়গা করে নিতে পারেন , দিলীপদাকে না দেখলে তা জানা হোতনা।

কলেজ জীবনের সহপাঠিনীদের সঙ্গে সখ্যতা সারাজীবনের পাথেয়। এখন সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা সহপাঠিনীদের যে কোনও কারুর সঙ্গে দেখা হ'লে বা কথা হ'লে তাদের কি আপনজন মনে হয়। পর পর দুবার প্রদীপ্তার সঙ্গে দেখা হ'ল , পূরবী এল বোধহয় গতবছর দূর আমেরিকা থেকে—সারাদিন গল্প করলেও কথা ফুরায় না। আর আশ্চর্য্য ,এতদিন পরেও ওদের ভিতরটা সেই আগের মতোই আছে।

দু'এক বছর আগে অদিতীর সঙ্গে বাড়িতে এল মৈত্রেয়ী, আর একবার সেফালী। আনন্দে মন ভরে উঠেছিল। দেখা হলে খুব ভাল লাগত রমা আর আলোলিকার সঙ্গে। ইউনিভার্সিটিতে এই দুজনের সঙ্গেই খানিক আলাপ আলোচনা হয়েছিল। শুনেছি আলোলিকা এখন একজন লেখিকা । ভালো লাগে ভাবতে।

অনাত্মীয়কে নিঃশর্ত আত্মীয়ের সম্পর্কে পেয়েছিলাম মালদা উইমেনস কলেজে পড়াতে গিয়ে। আমরা সব লেকচারাররা একটা প্রাইভেট হস্টেল করে থাকতাম। বোনে-বোনেও এত নিবিড় সম্পর্ক হয় কিনা জানিনা। একজনের টাকা ফুরালে, আর যে কেউ দেবে—নো দুশ্চিন্তা। কৃষ্ণা,-রুবী-মায়া-কল্পনাকে আত্মীয়ের মতো কাছে পাওয়ার সম্পর্ক ,-শেষদিন পর্যন্ত মনে থাকবে। একসঙ্গে গৌড়-পাণ্ডুয়া ঘোরা -যখন তখন অনুরাধার বাড়ি গিয়ে থাকা-খাওয়া। 'সেই সব দিন সে ও চলে যায়-' হায়-!

আজ এই বেলাশেষে, পেছন ফিরে তাকালে দেখি কত যে সম্পর্কের বাঁধনে প্রতি স্তরে বাঁধা পড়েছি তার ইয়ত্তা নেই। গোধূলির আলো ঝলমলে সেই সব সম্পর্কের সমৃতি আজ এক হীরক খণ্ডের মতো মনের আকাশে দ্যুতি বিকীর্ণ করে চলেছে। তাই বলতে ইচ্ছে করে, বিদায়বেলায় এই কথাটি জানিয়ে যেন যাই যা দেখেছি, যা পেয়েছি তুলনা তার নাই।

শ্রীমতী লিলি ব্যানার্জি এক আগ্রহী শিক্ষাবিদ ।বর্তমানে নিজের বাড়িতে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করে সে ই স্কুলটি পরিচালনার কাজে ব্যস্ত থাকেন। পূর্ব জীবনে মালদা উইমেন্স কলেজ এবং কাচরাপাড়া কলেজে শিক্ষকতা করেছেন ।লিলি প্রেসিডেন্সী কলেজ ও কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী। লিলি রবীন্দ্র রচনার বিশেষ ভক্ত এবং একজন পশু ও প্রকৃতি প্রেমী।

বিয়েবাড়ি

সুশোভিতা মুখার্জি

১৯৭৫ সাল হবে। পাপলু ক্লাস সিক্স এ উঠে নিজেকে খুব বড় মনে করছে। গরমের ছুটি। বারান্দায় বসে পাপলু গালে হাত দিয়ে ভাবছে এই লম্বা ছুটিটা কি করা যায় । তার প্রাণের বন্ধু টিটো কলকাতা গেছে কোনও দিদির বিয়ের ব্যাপারে। পাপলুর খুব দুঃখ, এত বড়টি হয়ে গেছে কিন্তু তার কোনদিন বিয়েবাড়ি দেখা হোলনা। টিটোর কাছে শুনেছে খুব নাকি হই হুল্লোড় আর আনন্দ করে সবাই। এমন সময় পিওন গেটের সামনে আসতেই পাপলু ছুটে গেল ।

হিন্দিতে প্রশ্ন করলে "কেয়া হ্যায় ?"

"খোকাবাবু, মাইজি কো বুলাও, টেলিগ্রাম হ্যায়"।

"মা" বলে ডাকতেই মা বেরিয়ে এসে সই করে টেলিগ্রামটা নিলেন। বিড়বিড় করে পড়তে লাগলেন "ফিক্স পাকা দেখা। কামিং ইমিডিএটলি"। পাপলু মার হাত থেকে ছোঁ মেরে টেলিগ্রামটা নিয়ে নিজেই বোঝবার চেষ্টা করতে লাগলো। পাকা আম, জাম, কলা এসব তার জানা আছে, কিন্তু পাকা দেখাটা আবার কি? মাথা চুলকে মাকে জিজ্ঞেস করেই ফেলল, "মা what is পাকা দেখা?" মা বিরক্তির সঙ্গে বললেন "বাজে বিরক্ত করিসনা, যা খেল গিয়ে।" কাল বড়মাসি আর মেশোমশাই আসবেন সবাইকে নিয়ে। বেবিদির পাত্র ঠিক করা হবে।" পাপলুর আবার পাল্টা প্রশ্ন "মা what is পাত্র?"

"পাত্র মানে বর।" মা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন।

পাপলু সমস্যায় পড়ে গেল। তার কাছে পুরো ব্যাপারটা রহস্যজনক হয়ে উঠলো। মা অবশ্য অনেকদিন ধরে বলছিলেন "জামাইবাবুর শরীর ভালো যাচ্ছেনা। বেবির বিয়েটা তাড়াতাড়ি হয়ে যাওয়া উচিত।" ঠাকুমা কলকাতা ফিরে যাবার আগে বলেছিলেন "মেয়ের পেছন দিকে আচমকা কলা গাছের বাড়ি দিলে, বিয়ে তাড়াতাড়ি হইবো"। "এই সময় দুধ যেন উথলে না পড়ে"। রাত্রিবেলা শুয়ে শুয়ে পাপলু অনেক জল্পনা কল্পনা করলো "বুনুকে (সাত বছরের বোন) একবার গাছ দিয়ে মেরে দেখতে হবে, অর বিয়ে হয় কিনা"।

তা বিয়েটা যে এত তাড়াতাড়ি হবে, তাও আবার এই মফঃস্বলের ছেলের সঙ্গে, তা কে জানত? খালি খালি মাথা চুলকোয় পাপলু, "পাত্র কে হতে পারে? মা ব্যস্ত হয়ে আছেন, হয়ত বেশী বার জিজ্ঞেস করলে আরও রেগে যাবেন"। বুনুর কানে ফিস ফিস করে বললে "তোর সাথে কথা আছে, দুপুরে ঘুমোসনা" দ্বিপ্রহরে মা ভাতঘুম দেবার সঙ্গে সঙ্গে পাপলু বুনুকে নিয়ে পেয়ারা গাছের তলায় পা ছড়িয়ে বসলো। বুনু বলল "আরে বোকা, অনেক পাত্র আছে এখানে, দীপককাকু, সমীরকাকু, বিদ্যুতকাকু, মনসুর আঙ্কেল। এদের মধ্যে কোনও একজন হবে। বুনুর মেয়েলি বুদ্ধি অনেক বেশি। চট করে ধরে ফেলেছে। "ওমা তাইতো?" পাপলু ভেবে দেখেনি। এরা সবাই বাবার অফিসে কাজ করে। অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার্স, সবাই পাপলুর বন্ধু। ছুটি হলে ওদের মেস-এ গিয়ে পাপলু কত রকম গল্প শোনে। তাদের ক্রিকেট টিম-এ কেউ অনুপস্থিত থাকলে, পাপলু এদের একজনকে ধরে নিয়ে আসে। পাপলু একটু নিশ্চিন্ত হোলো। বেবিদিদি তার খুব প্রিয় মানুষ। যারতার সাথে তো বিয়ে হতে পারেনা, গরমের ছুটিতে ওরা যতবার বড়মাসির বাড়ি বেড়াতে গিয়েছে, বেবিদি হোমটাস্ক দেখে দিয়েছে। কবিতা, আবৃত্তি ও নানান রকম খেলা শিখিয়েছে। পাপলুর নতুন খেলার জিনিস দরকার। বেবিদি তার হয়ে মার কাছে সুপারিশ করেছে। আরও কত কিছু। বেবিদির সান্নিধ্য তার কাছে মা, মাসিমনির থেকে কিছু কম ছিলনা।

পরের দিন বড়মাসি, মেশোমশাই, বেবিদি, রুপাদী ও বাবলুদা এসে উপস্থিত। বাড়িতে হইচই পড়ে গেল। প্রবাসের জীবন খুব নিঃসঙ্গ, তাই কেউ এলে বাড়ি জমজমাট মনে হয়। পাড়াপ্রতিবেশীরা নিজেদের আপনার লোক মনে করে মেতে ওঠে। একদিন দুপুরে পাত্রপক্ষকে আনবার ব্যবস্থা হোলো। ঠিক হোলো যে বাবা নিজে গিয়ে তাদের নিয়ে আসবেন। মা আর বড় মাসি নানান রকমের জলখাবার তৈরি করলেন। বিকেল চারটে বাজতে না বাজতেই পাপলু, বুনু, রুপাদী ও বাবলুকে নির্দেশ দেওয়া হোলো বৈঠকখানা ঘরে তারা যেন না যায়। পাপলু আর দাদা দিদিরা সিঁড়ির নিচে আত্মগোপন করলো। পাপলু মাঝে মাঝে উঁকি দিতে লাগলো নিচে। এমন সময় বাবা ঘরে ঢুকলেন দীপককাকুকে নিয়ে। পাপলু প্রায় লাফিয়ে উঠলো, আরে এযে দীপককাকু! বড় চুপচাপ কিন্তু খুব ভালোমানুষ! তবু মনটা যেন একটু দমে গেল। সে মনে মনে প্রার্থনা করেছিল যেন মনসুর আলী আঙ্কেল পাত্র হয়। কারণ সেই সবথেকে smart আর মিশুক। অগত্যা! দীপক কাকুর সাথে তাঁর মা ও বাবা এসেছিলেন I ঘরে অনেক কথা হচ্ছিলো I পাপলু কান খাড়া রেখেও কিছুই বুঝতে পারলনা। শুধু মশার কামড়ে তার গাল লাল হয়ে ফুলে উঠলো ।

নিজেকে সান্ত্বনা দিল যে এইটুকু কষ্ট সে বেবিদির জন্যে নিশ্চয় করতে পারে। হঠাত মা এসে সিঁড়ির তলায় দাঁড়িয়ে বললেন, "বেবির বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। এই তোরা এখানে কি করছিস?" পাপলু হুল্লোড় করে উঠলো। মশার কৃপাতে এবার তাহলে একটা বিয়ে দেখা যাবে! গরমের ছুটি মনে হচ্ছে মন্দ কাটবেনা।

বড় মাসি ফিরে গেলেন জলপাইগুড়ি। যাবার আগে মাকে আর বাবাকে অনেকবার বলে গেলেন তাড়াতাড়ি যাবার জন্যে। বিয়েবাড়িতে অনেক কাজ থাকে। মাসি বললেন "সব আমার পক্ষে সামলানো সম্ভব নয়"। এদিকে বাবার ছুটি নিয়ে বিরাট গোলযোগ বাঁধলো। পাহাড়পুর অঞ্চলে বিদ্যুৎবাহী লাইন চালু হবে, তাই বস বাবার ছুটি নাকচ করে দিলেন। বাবা বাড়ি এসে বললেন "আমার যাওয়া হবেনা, তোমরা ঘুরে এসো"। পাপলুর মন খারাপ হয়ে গেল। বাবা ছাড়া কোনও অনুষ্ঠান জমেনা। সে মাথা চুলকে বিজ্ঞের মতো বলল, "তোমার বিয়ে বলনা কেন? তাহলে নিশ্চয় যেতে দেবে?" বাবা হাত তুলতেই পাপলু ছুটে পালালো। এই তো কিছুদিন আগেই বাড়িতে স্কুল থেকে নালিশ এসেছিল- ব্যানার্জি স্যার বাংলা ক্লাসে বাক্য রচনা করতে দিয়েছিলেন এই কথা গুলি দিয়ে "ননীর পুতুল, তীর্থের কাক"। পাপলু নির্দ্বিধায়ে লিখেছিল "বাবা একটা ননীর পুতুল, মা একটি তীর্থের কাক"। সেদিন বাবার কাছে যথেষ্ট কানমলা খেয়েছিল। তাই আজ আর রিস্ক নিলনা।

যাবার দিন ঠিক হোলো। বাবার ছুটির ব্যবস্থাও হয়ে গেল কারণ একজন বিকল্প পাওয়া গেল। ধানবাদ থেকে ব্ল্যাক ডায়মন্ড ট্রেন ধরা হবে, তারপর শিয়ালদা থেকে দার্জিলিং মেল। ভোরবেলা নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছুলে, মেশোমশাই গাড়ি করে বাড়ি নিয়ে গেলেন। বড়মাসি পাপলুর গাল টিপে আদর করে বললেন "তোমাকে নতুন জামাইবাবুর দেখাশোনা করতে হবে কিন্তু"। পাপলু মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো, ভাবটা যেন এটা আর বড় কথা কি? বাড়িতে সেইতো বুনুর অভিভাবক।

মাসির শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়স্বজনদের সমাগম শুরু হতে থাকলো। পাপলু দেখল যে তার বয়সী গুটিকতক আরও ছেলেমেয়ে আছে। বাড়ির ছাদে একদিকে ম্যারাপ বাঁধা হয়েছে। সন্ধেবেলা মাসি দেখালেন বিয়ের বাজার। এতরকম জামাকাপড় দেখে পাপলু অবাক হয়ে গেল। বলেই ফেলল "এত পয়সা নষ্ট করা উচিত নয়"। মাসিরা হা হা করে হেসে উঠলেন। অবশ্য মাসি পাপলুর জন্যেও নতুন জামা কিনেছিলেন।

বিয়ের দিন সন্ধ্যেবেলায় বরযাত্রী এলো, সঙ্গে ব্যান্ডপার্টি ও রোশনাই। পাপলু রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাঁ করে দেখল। বেবিদির সাথে কথা হয়ে গেছে, বড় এলেই পাপলু তাকে জানিয়ে দেবে। বিয়েবাড়ির ভিড়। মা ব্যস্ত হয়ে পাপলুকে খুঁজতে লাগলেন। ফুচিকে দেখতেই মা বললেন, "হ্যাঁ রে, পাপলুকে দেখেছিস?" পাঁচ বছরের মেয়ে ফুচি ঘাড় বেঁকিয়ে বলল, "দেখবনা আবার? রাস্তার ওপর ব্যান্ডপার্টির সাথে মেহবুবা মেহবুবা গাইছে আর ফড়িং এর মতো লাফাচ্ছে"। মা জীভ কেটে বললেন, "ডাক ওকে, নিয়ে আয়"। এদিকে পাপলু দেখেছে গাড়ি থেকে দীপককাকু নামছেন, সাথে একটি ছোট ছেলে, সেও বর সেজেছে। পাপলুর উদ্দেশ্যে সে গর্বের সঙ্গে বলল, "আমি নিতবর", পাপলু শুনলও "নট বর" অর্থাৎ "আমি বর না"। বিজ্ঞের মতো হেসে পাপলু নিজের মনে বলল "আরে বাবা তুমি যে বর না সে তো আমি জানি"। এরপর বড়মাসি জামাইয়ের মাথায় হাত ঠেকিয়ে কুলো-তেল-মিষ্টি দিয়ে বরণ সারলেন। মাথায় টোপর দিয়ে, গলায় সুগন্ধি মালা পরিয়ে বরণ করলেন। তারপর জামাইকে ছাদনাতলায় নিয়ে যাওয়া হোলো। পাপলু দেখল দীপককাকু নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। পাশ থেকে নাড়ু আর কাছুদা (বেবিদির যমজ খুড়তুতো ভাই) বিড়বিড় করছিল "একে তো এতটা জার্নি করে কলকাতা থেকে আসা, তারপর বিয়ের হ্যাপা! দেখে মনে হয় ঘেঁটে গেছে"। "ঘেঁটে যাওয়া কাকে বলে নাছুদা?" পাপলু সরল মনে জিজ্ঞেস করলো। "দাঁড়া দেখাচ্ছি তোকে", এই বলে নাছুদা হাত বাড়িয়ে পাপলুর চুল ওলট পালট করে দিল। কথা না বাড়িয়ে পাপলু ছাদনাতলায় গিয়ে বসে পড়ল। তাকে দেখেই দীপককাকু বললে "এই যে পাপলু বাবু! তুমি আমার সব থেকে কাছের মানুষ, আমার ডান হাত। নো মোর কাকু, আজ থেকে জামাইবাবু!" পাপলু এত সম্মান পেয়ে একেবারে গদগদ। মনে মনে পণ করলো যে এই নতুন জামাইবাবুকে সব অবস্থায় রক্ষা করতে হবে। একটু পরেই জামাইকে বিয়ের পিঁড়িতে বসানো হোলো। সেখানে ছিল আরও দুজন, বেবিদির মেজকাকা আর পুরুতমশাই। তাদের পাশে সহকারী পুরুত। এই মেজকাকা বারোমাস সর্ষের তেল মেখে চান করেন বলে ভাইপো ভাইঝিরা আড়ালে নাম রেখেছে সর্ষে। বর পিঁড়িতে বসামাত্র পুরুত মন্ত্র শুরু করে দিল। কপালে জল ঠেকিয়ে, হাত বেঁকিয়ে অং বং চং করতে করতে হাতে একটা আংটি আর ঘাস জাতীয় কিছু পরিয়ে দিল। এরপরেই সহকারী পুরুত বলে উঠলো, "এবার উঠুন আর কাপড় পাল্টে ফেলুন!" পাপলু বেগতিক দেখে নতুন জামাইবাবুকে রক্ষা করার ভঙ্গিতে পেছন থেকে জাপ্টে ধরল। জামাইবাবু কিন্তু একটু cheesy হাসি দিয়ে চুপচাপ বসে রইলেন।

বেবিদিকে খুব সুন্দর লাগছিল। হেড পুরুত হিন্দি সিনেমার কায়দায় মন্ত্র উচ্চারণ করছিলেন, আর ঠিক ঠিক মুহূর্তে চেঁচিয়ে বলছিলেন, ‘‘সোবি তুলো’’।

একের পর এক অনুষ্ঠান চলল, হাতে হাত রাখা, সিন্দূর দান, যজ্ঞের আগুনে খই ফেলা। চল্লিশ মিনিটে বিয়ে শেষ। পিঁড়ি থেকে উঠে পুরুত বললেন, ‘‘বিয়া শ্যাস’’, আমি সল্লাম’, নাছুদা গুনগুন করে গান হেয়ে উঠলো ‘‘এক গোছা টাকা হাতে নিয়ে বললাম চললাম, বেশ কিছু সময় তো থাকলাম, তোমাদের মন রাখলাম ...’’

এরপর বেবিদি ও নতুন জামাইকে ঘিরে হাসিঠাট্টা আর ছবি তোলা চলতে থাকলো। পাপলুর খিদে পেয়েছে। তাই সে গুটি গুটি খাবারের তাঁবুর দিকে এগিয়ে গেল। মেনু তো আগে থেকেই জানা – বেগুন ভাজা, লুচি, ছোলার ডাল, ফিসফ্রাই, ঘিভাত, মাছের কালিয়া, মাংস, চাটনি, রসগোল্লা, সন্দেশ আর দই। বসার জায়গা খুঁজতেই কাছুদা জীব কেটে বললে ‘‘ওমা তুই তো মেয়ের বাড়ির লোক, এখন খাবি কি? আগে তো বরযাত্রীদের খাওয়াবি!’’ এই বলে তাকে পরিবেশন করতে লাগিয়ে দিল। ডালের হাঁড়ি নিয়ে পাপলু এদিক ওদিক তাকাতেই, একজন বুড়ো ভদ্রলোক হেঁড়ে গলায় ডাক দিলেন, ‘‘এই যে ছোকরা, এদিকে একটু ডাল দেখি।’’ পাপলু অপটু হাতে ডাল দিতে গেলেই, বেশ খানিকটা ভদ্রলোকের পাঞ্জাবিতে পড়ে গেল। অমনি নাছু আর কাছুদা ষাঁড় এর মতো গ্যাক গ্যাক করতে ছুটে এলো। পাপলু বুঝলো এই ভদ্রলোক নিশ্চয় বরযাত্রী দলের উচ্চপদস্থ কেউ হবে, বেগতিক দেখে সে ছুটে পালালো।

অনেক রাত হল। ছাদের ওপর ডেকরেটাররা ফরাস পেতে শোবার ব্যবস্থা করেছিল। খোলা আকাশের নীচে, তারা দেখতে দেখতে পাপলু কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। নিঝুম রাত, হঠাত্‍ হইচই এর আওয়াজে পাপলুর ঘুম ভেঙ্গে গেল। পাশে দেখল বাবা শুয়ে আছে। পাপলু ছাদের দরজা খুলে নিচে নামতেই দেখল বাড়ির সবাই উঠে পড়েছে আর গোল গোল করে ছুটছে। কেউ নিচে যাচ্ছে তো কেউ দোতলায় উঠছে, যেন সবাই কানামাছি খেলছে। মনে মনে ভাবলো ‘‘বিয়েবাড়ির কোন নিয়ম হবে!’’ সিঁড়ি দিয়ে ঝুঁকে দেখল সবার হাতে অস্ত্র, কারুর হাতে চটি, তো কারুর হাতে জুতো। ছাতা ও পর্দার লাঠিও বাদ পড়েনি। মা ও মাসিরা আলুথালু ভাবে চিৎকার করছিল ‘‘চোর চোর’’। তাদের গলার আওয়াজ কেঁপে কেঁপে উঠছে আর নামছে। ঠিক যেন নটা বাজার সাইরেন। পাপলু ছুটে এসে বাবাকে জাগিয়ে তুলল, ‘‘বাবা ওঠ, চোর এসেছে’’। ঘুমকাতুরে বাবা বললেন, ‘‘কে? কে এসেছে রে?’’ পাপলু উত্তেজিত হয়ে বলল, ‘‘তাড়াতাড়ি চল, চোর এসেছে যে!’’ বাবা হাই তুললেন, তারপর চোখ রগড়াতে রগড়াতে বললেন, ‘‘চোর আর আসার সময় পেলনা? ভালো ঘুমটা হচ্ছিল’’। পাশে ছিলেন বেবিদির মেজকা, অর্থাৎ সর্ষে। তিনি বললেন, ‘‘সুভাষ, চোর এইসময় আসবেনা তো কি সকাল বেলায় ভেঁপু বাজিয়ে আসবে?’’ এতক্ষণে বাবা জেগে উঠেছেন। পাপলুর হাত ধরে বললেন, ‘‘চল, আজ চোরব্যাটাকে হাজতে পাঠাব’’।

সবাই নিচের দিকে এগোতে লাগলো। রান্নাঘর থেকে একটা ক্ষীণ আলো দেখা যাচ্ছিল। নাছুদা দরজা ঠেলে খুলতেই দেখা গেল ছোটকাকা পিঁড়ির ওপর বসে বিড়ি খাচ্ছেন। মাসি বললেন, ‘‘একি, তুমি এখানে? মাঝরাতে?’’ ছোটকা বললেন, আর বলেন ক্যান বৌদি, ভীষণ খিদে পাইসিলো, তাই নিচে নাইমাসিলাম খাবারের সন্ধানে। আইসা দেখি সুশীলবাবুও রান্নাঘরে মিষ্টি খাইতেসেন। অনেক গল্প করসিলেন, দ্যাশের কথা, সমাজের কথা। তা উনি কইলেন যে দিনকাল ভালো নয়। গয়নাগাটি সামলে রাখবেন। আমি কইলাম, সে আর বলতে? সব গয়না বৌদির ঘরের আলমারিতে। তোমাদের আওয়াজ পাইয়া, লজ্জা পালেন আর চটপট সইলা গ্যালেন’’।

‘‘সুশীলবাবুটা কে?’’ সবাই একসাথে চিত্‍কার করে উঠলো।

ছোটকা বলতে লাগলেন, ‘‘ক্যান? উনি তো কইলেন বরযাত্রীর লগে আইস্যাছেন, আর বাবাজীবনের আত্মীয় হন।’’

এদিকে নতুন জামাই হন্তদন্ত হয়ে উপস্থিত। ‘‘আমাদের ঐ নামে কোন আত্মীয় নেই, এবং সুশীলবাবু বলে কেউ আসেননি আমাদের সাথে’’, সাফ জানিয়ে দিলেন নতুন জামাই।

শুনে ছোটকা চিত্‍কার করে উঠলেন, ‘‘ওঁ, আমি কি তাহলে সোরের সাথে বাক্যালাপ করসিলাম?

খিটখিটে মেজকা (সর্ষে) দাঁত খিঁচিয়ে উঠলেন, “হ্যাঁ, তাই করসিলে, এবারে আমরা তোমার মুণ্ডপাত করুম, তুই বিয়া করিস নাই। ভালই করছস”।

ছোটকা চ্যাঁচাতে থাকলেন, “আমি সোটবেলাতে মুগুর তুলসী, ডাম্বেল ঘুরাইসি। আমার উপর সোর বাটপারি করবা? এই বলে তিনি ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

এমন সময় পাশের বাড়ি থেকে এক ভদ্রলোক হাঁক দিলেন, ”বাবলু, দেখ, পেছনের দেওয়ালের কার্নিশে একজন লোক বসে আছে।”

এরপর পুলিশ এলো, চোরকে কার্নিশ থেকে নামিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হল। চোর মাথা নামিয়ে বলল, “বেবির বিয়ে, তাই ওকে রোজ দেখতে আসতাম। বেবি ভালো মেয়ে, আমাকে রোজ ভাত দেয়”। বলা বাহুল্য বেবিদি অনেক সময়, দুপুরবেলা না খেলে ভাত জানলা দিয়ে ফেলে দিত। বোঝা গেল চোর অনেকদিন ধরে বিয়েবাড়ির ওপর নজর রেখে, সুযোগ বুঝে সিঁধ কাটবার প্ল্যান করেছিল। পুলিশ এসে সুশীলবাবু ওরফে চোরমশাইকে থানায় নিয়ে গেল।

বিয়ে শেষ। বাড়ি ফেরবার পথে মা বললেন পাপলুকে, “তোমার না বাংলাতে প্রবন্ধ লেখার কথা? গরমের ছুটি কেমন কাটালে? তাড়াতাড়ি লিখে ফেল।”

পাপলু লিখতে বসলো। প্রবন্ধের নাম ছুটি।

সুশোভিতা মুখার্জি ওহায়ো স্টেটের বাসিন্দা। অ্যান আর্বার মিশিগানে রিসার্চ সায়ানটিস্টের কাজে ব্যস্ত থাকেন। মাঝে মাঝে অবসর পেলে নিজের জীবনের ঘটনাবলি থেকে কোনও কোনও মজার অভিজ্ঞতা পাঠককে আনন্দ দেবার উদ্যেশে লিপিবদ্ধ করেন।

রোম শহরের একটুখানি

প্রদীপ্তা চ্যাটার্জি

এবারে রোম নিয়ে একটু লিখছি। জুনের শেষে ইটালির ভেরোনাতে ছিল আমার স্বামীর কনফারেন্স, তারপরে রোম শহরটা একটু ঘুরে ফিরে দেখবার প্ল্যান করা গেল। রোম বাঙালির কাছে স্বপ্নের শহর, সেই ইটার্নাল সিটি, যার কথা ছোটবেলায় কত শুনেছি। তবে এখন পৃথিবী অনেক অন্যরকম হয়ে গেছে, আজকের রোম আর স্বপ্ন নয়, সৌভাগ্যবশত: অনেক মানুষই আজ বেড়াতে আসতে পারেন এখানে, তবুও এই লেখাটি হবে শুধু আমার নিজের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা রোম।

আমাদের সঙ্গে চলেছে ১৭ বছরের কেসি, আমাদের নাতনী. সেটাও একটা উপরি পাওনা।। ভাবলাম কেসির চোখে এবারে রোমকে নতুন করে দেখা যাবে। কেসিও খুব উত্তেজিত, ইটালিয়ান ভাষাটা আগে শেখা হয়নি বলে খুব দুঃখ তার, ইন্টারনেটের মাধ্যমে কিছু ইটালিয়ান শব্দ শেখবার চেষ্টা সুরু করে দিল, পরে অবশ্য রোমে পৌঁছে রেস্তোরাঁর মেনু পড়বার সময়ে কেসির ইটালিয়ান বেশ কাজে লেগেছিল।

রোমে আমাদের হোটেলটা ছিল শহর থেকে বেশ খানিকটা দুরে এয়ার পোর্টের কাছে। সকালে উঠেই হোটেলের সাটল বাস নিয়ে চলে এলাম রোম শহরে, নামলাম এসে টাইবার নদীর উপর সেন্ট অ্যাঞ্জেলো ব্রিজের পাশে। রোম শহরটি গড়েই উঠেছে ২৪৪ মাইল লম্বা টাইবার নামে এক নদীর ধারে, পরে টাইবার গিয়ে মিশেছে ভূমধ্যসাগরে। এই টাইবার নদিতেই নাকি এককালে ছুঁড়ে ফেলা হয় রোমের সম্ভাব্য প্রতিষ্ঠাতা শিশু রোমুলাস ও রেমাস কে। পশ্চিম সভ্যতার জন্ম হয়েছে এই অঞ্চলে, ৭৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দেরও অনেক আগে।

রোম শহরে নতুন আর পুরানো মিলেমিশে এক হয়ে আছে, এ এক অপূর্ব সমন্বয়। সেন্ট অ্যাঞ্জেলো ব্রিজ থেকে দেখা যায় দুরে সেন্ট পিটার্স বে-সিলিকা আর সেন্ট অ্যাঞ্জেলো দুর্গ। এখানে পুরনো দিনের ইতিহাস যেন জীবন্ত; সেন্ট অ্যাঞ্জেলো ব্রিজে পথের দুইধারে পাথরের উপরে মনোহর কারুকার্য করা সারি বাঁধা এঞ্জেলদের মূর্তি সাজানো; একটু দুরের পাথুরে রাস্তা গুলি উঁচু নিচু আর ধুসর রঙের, ঠিক যেমনটি সেই হাজার হাজার বছর আগে ছিল। অন্যদিকে রোম একটি অতি আধুনিক এবং কসমোপলিটান সিটি। চারিদিকে নানা মানুষ নানা জাতির, বেশীর ভাগই টুরিস্ট বলে মনে হয়। আজকাল ইউরোপে এসে আমি বেশ স্বচ্ছন্দ বোধ করি। নানা বর্ণের মানুষের মাঝে নিজেকেও এদের একজন বলে মনে হয়। প্রথম জীবনে সত্তরের দশকে যখন আসতাম তখন কাছাকাছি শুধুই একই রকমের মানুষের ভিড় দেখতাম, নিজেকে মনে হোতো এক আগন্তুক। হয়তো এখনও তাই, তবু আজকাল ভাবি যে আমিও এদেরই একজন।

রোমে দেখলাম বেশ কিছু বাংলাদেশ থেকে সম্প্রতি আসা থেকে অভিবাসী রয়েছেন, এর ভিতরে কেউ কেউ হপ অন অ্যান্ড হপ অফ নামক টুরিস্ট বাস কোম্পানির টিকিট বিক্রি করছেন। টিকিট কেনবার সময় দুই এক জনের সঙ্গে বেশ বাংলায় গল্প করা গেল। জানতে পারলাম ইউরোপে আসবার পরে বেশ কিছু বছর এঁদের কষ্ট করেই জীবন কাটে, পরে কারুর কারুর জীবনে হয়ত খানিক স্থিতি আসে। এই হোল সেই চিরকালীন *দিয়াসপোরা* অথবা নিজের জন্মস্থান ছেড়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়া মানুষদের গল্প।

হপ অন অ্যান্ড হপ অফ টুরিস্ট বাসের সুবিধে হোল যে এই যে, এই বাসের একদিন বা দুইদিনের টিকিট কাটলে যতবার ইচ্ছে ওঠানামা করা যায়। একটি স্টপে নেমে জায়গাটি দেখে আবার একই কোম্পানির অন্য একটি বাস ধরে নিয়ে যাওয়া যায় পরের গন্তব্য স্থলে।

প্রথমে নামলাম কলোসিয়ামের স্টপে, কলোসিয়াম পুরনো রোমের সেরা স্মৃতিচিহ্নের একটি। ভেসপেসিয়ান বলে ফ্লেভিয়ান বংশের এক রাজা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই পাথরের তৈরি অ্যাম্ফিথিয়েটার যা কলোসিয়াম নামে পরিচিত হয়ে উঠেছিল।

কলোসিয়াম রোম সাম্রাজ্যের প্রভূত শক্তি এবং তার দীর্ঘ, নিষ্ঠুর ইতিহাসের একটি বিশাল প্রতীক। এই অবিস্মরণীয় স্থপতি মনে করিয়ে দেয় রোমের সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাস। কলোসিয়ামের ভিতরের সারিবাঁধা স্তম্ভগুলির আশেপাশে, শত শত শতাব্দী ধরে কত যে মানুষ ও প্রাণী হত্যা করা হয়েছে তার ঠিক নেই, এদের কারুর কোনও অপরাধও ছিল কিনা তাই বা কে জানে। মনে হয় এই কালজয়ী স্থাপত্যের ভিতরের বাতাস আজও ভারি হয়ে আছে বহু মানুষের দীর্ঘশ্বাসে।

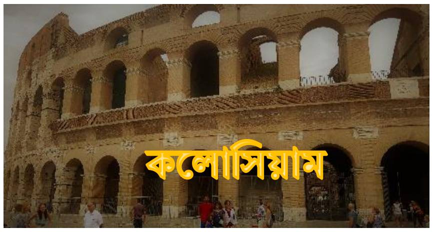

আজকের কলোসিয়াম অবশ্য সেই পুরনো অ্যাম্ফিথিয়েটারের ধ্বংসাবশেষ মাত্র, ভূমিকম্প, অগ্নিকাণ্ড ও ডাকাতির জন্য অনেকটাই শেষ হয়ে গেছে। পুনর্নির্মাণের প্রচেষ্টাও শুরু হয়েছে ১৯৯০ সাল থেকে, তবুও সবটা ঠিক আগের মতো করা যায়নি।

বিকেল প্রায় শেষ হয়ে আসছিল, দুপুরের উত্তপ্ত পরিবেশ এখন আরামদায়ক, মৃদু আর মিঠে বাতাস বইছে বোধহয় দক্ষিণ দিক থেকে, সারাদিনের ক্লান্তিও যেন দুর হয়ে যাচ্ছিল। কলোসিয়ামে ঢোকবার লাইন অসম্ভব লম্বা দেখে আশাহত হলাম, কেসির কিন্তু ভিতরে যাবার তাগিদ নেই, সে মুক্ত বাতাস পছন্দ করে। তাই আমরা আস্তে আস্তে রোমান ফোরামের দিকে অগ্রসর হতে থাকলাম।

রোমান ফোরাম এককালে ছিল রোমান সাম্রাজ্যের কেন্দ্র, এইখানে, রোম শহরের ঠিক মাঝখানে ছিল সব অতি প্রয়োজনীয় বাড়ি ঘর, যেমন রোমান সেনেট, আইন আদালত, সম্রাটের প্রাসাদ, দোকান পাট এবং খোলাবাজার ইত্যাদি। এত বছর পরেও কিছু কিছু অরিজিনাল ইমারতের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। আমরা এক ইঁট বাঁধানো বেদীর মতো জায়গায় বসে খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিলাম, কে জানে এই বেদীটি হয়তো সেকালের কোনও রোমান তোরণের অবশিষ্টাংশ!

পরের দিন প্রথমেই যাওয়া গেল ভ্যাটিকানে। ভ্যাটিকান এলাকাটি এক বিশাল পাথরের চাতাল দিয়ে ঘেরা, এটিও সেই টাইবার নদীর আরেক পাশে একটি টিলার উপরে অবস্থিত, এখানেই পোপের বাড়ি। এই জায়গাটি পশ্চিম সভ্যতার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ভ্যাটিকান সিটির মিউজিয়ামগুলি পৃথিবী বিখ্যাত; পাপাল স্টেটের সুবর্ণ যুগে তৈরি হয়েছিল এখানকার সেন্ট পিটার্স বা-সিলিকা এবং সিস্টিন চ্যাপেল। সেন্ট পিটার্স বা-সিলিকার স্থাপত্য অবিস্মরণীয়; সিস্টিন চ্যাপেলে পৃথিবী-বিখ্যাত চিত্রশিল্পী এবং ভাস্কর মাইকেলেঞ্জেলো, রাফাএল এবং সান্দ্রো বত্তিসেলির কালজয়ী স্থাপত্য এবং অন্যান্য আর্ট-ওয়ার্ক আছে।

মিউজিয়ামের সামনে আর চারিদিকে বহু মানুষ সেল্ফি তুলতে খুব ব্যস্ত। নানাজাতর পসারির মেলা দেখা গেল এই বিশাল চাতালে, তারা ক্রেতা খুঁজে বেড়াচ্ছে , ছোটখাটো ট্রিঙ্কেট বিক্রি করতে চায়, কেনবার জন্য একেক সময় বেশ জোরাজুরিও করছে। এই কোলাহলে চারিদিকের শান্ত সমাহিত মাধুর্য উপভোগ করা সম্ভব নয়। অবশ্য আজকের জগতে অনেক নির্দোষ মানুষকেও নিজের দেশে নানারকম রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সংক্রান্ত অশান্তির সম্মুখীন হয়ে, বাধ্য হয়ে অজানা দেশ ও অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের পথে পাড়ি দিতে হয়, নতুন জীবন সুরু করবার আশায়। হয়ত এইসব বিক্রেতারাও সেইরকম, এবং সামান্য রোজকারের চেষ্টা করছেন নতুন দেশে স্থিতি পাবার আশায় নানা প্রতিকুল সমস্যার সঙ্গে লড়াই করে। এঁদের ব্যবহারে বিরক্তি বোধ করবার জন্য মনে মনে লজ্জিত হলাম।

পরের স্টপ প্যানথিয়ন। এখানে ঢুকে দেখি চারিদিকে অন্ধকার, চোখ অভ্যস্ত হতে একটু সময় লাগে, কানে আসে কেসির হা হা হাসি, তখন ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে পাওয়া গেল মাথার উপরে সিলিঙে একমাত্র আলোর উৎস, দেখা গেল এক গোলাকৃতি নকশা থেকে আলোর বন্যা এই বিশাল হলঘরে ছড়িয়ে পড়ছে। প্যানথিয়নের ভিতরে সবাই দেখলাম ছবি তুলছেন, আমরাও তাই ছবি তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম।

প্রাচীন কালে, ২৭ থেকে ২৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সাতটি রোমান দেবতার উদ্দেশে (সূর্য, চন্দ্র, শুক্র, শনি, বৃহস্পতি, বুধ, মঙ্গল) নির্মিত হয়েছিল এই রোমান প্যানথিয়ন, যা তখন ছিল একটি ছোট মন্দির। সেই প্রাক্তন মন্দিরটির মূল কাঠামোর ভিত্তির উপরেই ১১৮ থেকে ১২৫ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট হেড্রিয়ন এখনকার রোমান প্যানথিয়ন তৈরি করেন। রেনেসাঁর সময় থেকে প্যানথিয়নকে একটি সমাধি হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে এবং রেনেসাঁ যুগের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ও স্থপতিকার রাফাএল, ইতালির রাজা ভিটোরিও ইমানুয়েল, ইত্যাদি কিছু বিখ্যাত ব্যক্তির শেষ বিশ্রাম-স্থল এখানেই।

ঘোরাঘুরিতে সকলেরই খিদে পেয়ে গেছে, ঠিক হোল স্প্যানিশ স্টেপস এর কাছাকাছি গিয়ে লাঞ্চ খাওয়া হবে। একটি ট্যাক্সি নিয়ে সেখানে গিয়ে দেখা গেল যে আমাদের পছন্দের রেস্তরাঁটিতে তে বেজায় ভিড়, তখন আমরা বসবার জায়গার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম আর কেসি স্প্যানিশ স্টেপস দিয়ে ওঠানামা করতে গেল।

স্প্যানিশ স্টেপস, হচ্ছে রোমান বারোক স্টাইলে ১৮ শতাব্দীতে তৈরি অনেকগুলি সিঁড়ির সারি, এর ১৩৫ টি খাড়াই ধাপ কখনও সোজা কখনও বাঁকা, । নিচের পিয়াদজা দি স্পানিয়া (এখানে স্প্যানিশ এমব্যাসি আছে, তাই এই নাম) থেকে এই সিঁড়ি গুলি দিয়ে উঠে উপরের পিয়াদজা ত্রিনিতা দেই এমন্টি তে পৌঁছে যাওয় যায়, সেখানে টুইন টাওয়ার নামে একটি নামকরা চার্চ আছে।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করবার পরে রেস্টুরেন্টের ওয়েটার আমাদের আপ্যায়ন করে লাল হলুদ ছাতার নিচে বসাল। পাস্তা, সেঁকা সবজি, আর ক্যালোরির কথা ভুলে গিয়ে প্রচুর মিষ্টি লেমনেড দিয়ে আমাদের দুপুরের খাওয়া শেষ হোল।

পিয়াদজা ত্রিনিতা দেই এমন্টি তে একটি বেঞ্চ খালি পাওয়া গেল ফুলের দোকানের ছায়ায় ঢাকা, সেখানে বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার পরে আবার সেই রৌদ্রের তাপ মাথায় নিয়ে খাড়াই উৎরাই পথ ধরে খানিক হেঁটে পৌঁছে গেলাম ট্রেভি ফাউন্টেনে।

ট্রেভি ফাউন্টেন, ইতালিয় ভাষায় ফন্টনা দ্য ট্রেভি গঠিত হয়েছিল ১৭০০ এর দশকে। পালাৎজো পোলি নামক এক অট্টালিকার সামনে এই ৮৫ ফুট উঁচু এবং ৬৫ ফুট চওড়া বিশ্বের বৃহত্তম বারোক স্টাইলের ফোয়ারাটি তৈরি করবার পরিকল্পনা করেছিলেন কবি ও দার্শনিক নিকোলা সালভি, আর তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে ১৭৬২ খ্রিস্টাব্দে জোভানি পাওলো পানিনি নামে এক বিখ্যাত স্থপতি-কার এই ফোয়ারাা নির্মাণের কাজ শেষ করেন।

ট্রেভি ফাউন্টেনের ঝরনার মাঝে কয়েকটি অপরূপ মার্বেল পাথরের মূর্তির দ্বারা এক সুপরিকল্পিত দৃশ্য উপস্থাপন করা হয়েছে যার বিষয়বস্তু হোল জলের নিয়ন্ত্রণ। ফোয়ারার ঠিক মাঝখানে অবস্থিত করা হয়েছে গ্রিক সাগর দেবতা ওসিয়ানাসের এর মূর্তিকে , আর চারিপাশে ছড়ানো রয়েছে ট্রাইটনস্ (অর্ধ-মানব), সি-হর্স, এবং গ্রিক আর রোমান মিথলজির অন্যান্য চরিত্রগুলির শিলারূপ। সালভির মনশ্চক্ষুতে কল্পনা করা এই সিম্বলিজমে দেখানো হয়েছে যে বাম দিকের ট্রাইটন নিয়ন্ত্রণ করবার চেষ্টা করছেন এক অস্থির ঘোড়াকে, যা অশান্ত সমুদ্রের প্রতীকী, এদিকে ডাইনের ট্রাইটনের অশ্বটি ধীর এবং স্থির, যা বোঝাচ্ছে সমুদ্রের শান্ত সমাহিত রূপ।

ট্রেভি ফাউন্টেনে কয়েন ছোঁড়ার প্রথা আছে, প্রতিদিন নাকি ৩০০০ মতো ইউরো পাওয়া যায় আর এই অর্থ রোম শহরের অভাবী মানুষের প্রয়োজনে ব্যয় করা হয়। ট্রেভি ফাউন্টেন অঞ্চলটি দেখা গেল সবচাইতে বেশি জনাকীর্ণ। চতুর্দিকে সারি বাঁধা স্যুভে্নিয়র আর জিলাটোর দোকান। আমি স্যুভেনিয়রের দোকান দেখতে এবং নানা অপ্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে খুবই ভালবাসি কিন্তু কেসি সময় এবং অর্থের অপব্যবহার পছন্দ করে না বলে আমিও তার মতামতকে সম্মান জানালাম। ঠিক হোল আমি একটা নির্দিষ্ট সময়ের ভিতরে আমার দোকান দেখা

বা কেনাকাটা শেষ করবো, আর সেই সময়টা কেসি গিয়ে হাজার লোকের ভিড়ে প্রখর সূর্যের নিচে ট্রেভি ফাউন্টেনের পাথরের ধাপে বসে এই ঝরনার শোভা দেখবে।

আমাদের রোমে থাকবার দিনগুলি দ্রুত ফুরিয়ে আসছিল। তখন কেসির বক্তব্য হল যে সে টুরিস্ট স্পট দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে গেছে, তাই এবার আসল রোমে সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রা একটু দেখতে চায়।। সে তার গাইড বই থেকে বার করেছে যে এখানে মন্টি নামে একটি অতি সৌখিন শহরতলী আছে, এবং কেসির খুব ইচ্ছে রোমের শেষ দিনটা এই মন্টি নামে জায়গাটি ঘুরে ফিরে দেখা।

কেসির ইচ্ছের দাম তো দিতেই হবে, নাতনি বলে কথা! দেখা গেল এই মন্টি নামে পাড়াটি কলোসিয়াম থেকে বেশ কাছেই। প্রাচীন কালে এই অঞ্চলের বেশ দুর্নাম ছিল *স্লাম এরিয়া* বলে। পরে এই এলাকাটিকে নতুন করে তৈরি করা হয় এবং এখন এখানকার বাড়িঘর, দোকানপাট সবকিছুই খুব সৌখিন অথচ বাহুল্যবর্জিত, সৌন্দর্যের এই পরিমিত প্রকাশ পুরনো রোমের ঐশ্বর্যময় ইতিহাসকে মনে করিয়ে দেয়।

মন্টিতে এসে ট্যাক্সি ছেড়ে দেওয়া হোল, কারণ হেঁটে না দেখলে তো মন্টির বিশিষ্টতা উপভোগ করাই যাবেনা। এখন কেসির উৎসাহ দেখে কে? ওরই পরামর্শে মন্টির পশ্চিম প্রান্ত থেকে এক খাড়াই পাথুরে রাস্তা ধরে হাঁটা সুরু করা গেল। পথের দুইপাশের বাড়িগুলি মনে হয় হলুদ রঙের বিভিন্ন সংমিশ্রণে রঙ করা , রাস্তাঘাট, কাফে, পুরনো বইয়ের দোকান সবকিছুই মনে হোল অতি রুচিসম্মতভাবে পরিকল্পিত। মাঝপথে এসে পৌঁছান গেল বারোক পালাৎজো নামে একটি জায়গাতে,এখানে দেখা গেল এক মধ্যযুগে নির্মিত দুর্গ এবং নয় শতাব্দীতে তৈরি কিছু স্থাপত্যকর্ম।

মন্টি নামে পাড়াটি সত্যিই অনুপম। আমরা অতিরিক্ত গরম ও আর্দ্র আবহাওয়ার দরুন ক্লান্ত বোধ করবার জন্য এই সৌন্দর্য্ ঠিক উপভোগ করতে পারছিলাম না। তবুও সারা দুপুরটা হেঁটে হেঁটে কিছু দুষ্প্রাপ্য বইয়ের হলদে হয়ে যাওয়া পাতা দেখা হোল, অনেক অপ্রয়োজনীয় অতি দামি অ্যান্টিক্ জিনিষপত্রও নাড়াচাড়া করা গেল, এরপরে ক্লান্তি দুর করতে উৎকৃষ্ট কাপুচিনো আর বরফ ঠাণ্ডা জিলাটোও খাওয়া হোল বিশিষ্ট কফি-সপে বসে। এইসবেতে মন ভরে গেল আনন্দে। তবু লাঞ্চ তো খেতেই হবে এত ঘোরাঘুরির পরে। এদিকে মন্টির সৌখিন সব কাফের লাঞ্চ মেনু আমার স্বামী মানসের কিছুতেই পছন্দ হোলনা, তিনি আবার একটু সাধারণ খাবার পছন্দ করেন। তাই আমাদের সেই ট্যুরিস্টি রোমেই ফিরতে হোল পছন্দসই খাবারের খোঁজে।

মন্টি দিয়ে আমাদের এবারের রোম দেখা শেষ হোল।

নিউ ইয়র্ক স্টেটের ভেস্টাল শহর নিবাসী, প্রদীপ্তা চ্যাটার্জি অফিস অফ মেন্টাল হেল্থের কাজে এখনও ব্যস্ত। অবসর পেলে সামান্য লেখালেখির চেষ্টা করে থাকেন।

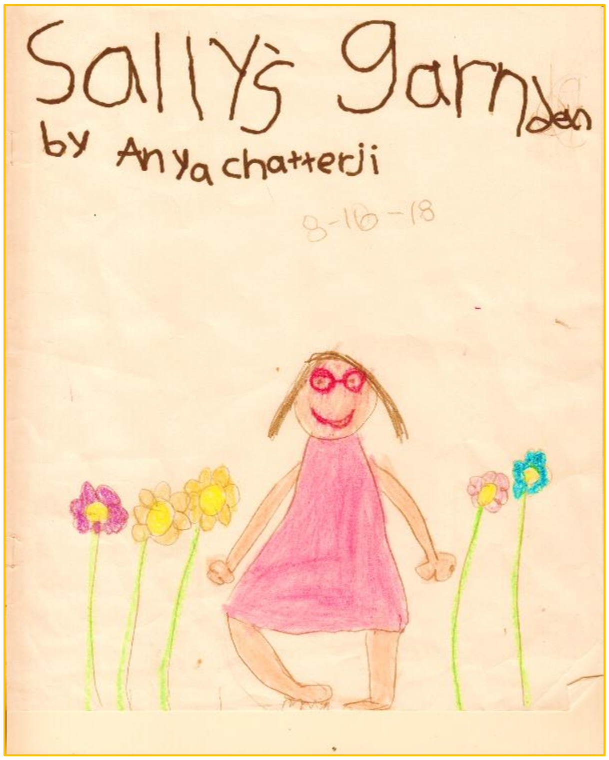
Sally's garnden
by Anya chatterji
8-16-18

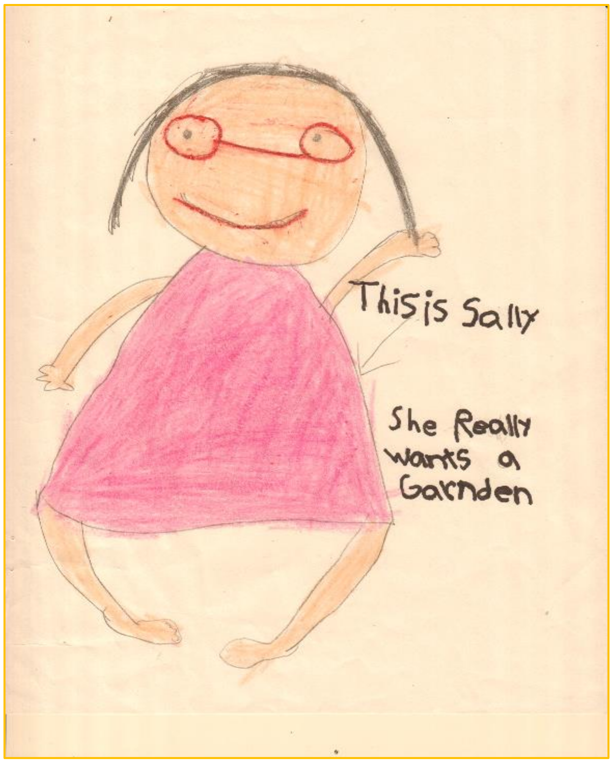
This is Sally
She Really wants a Garnden

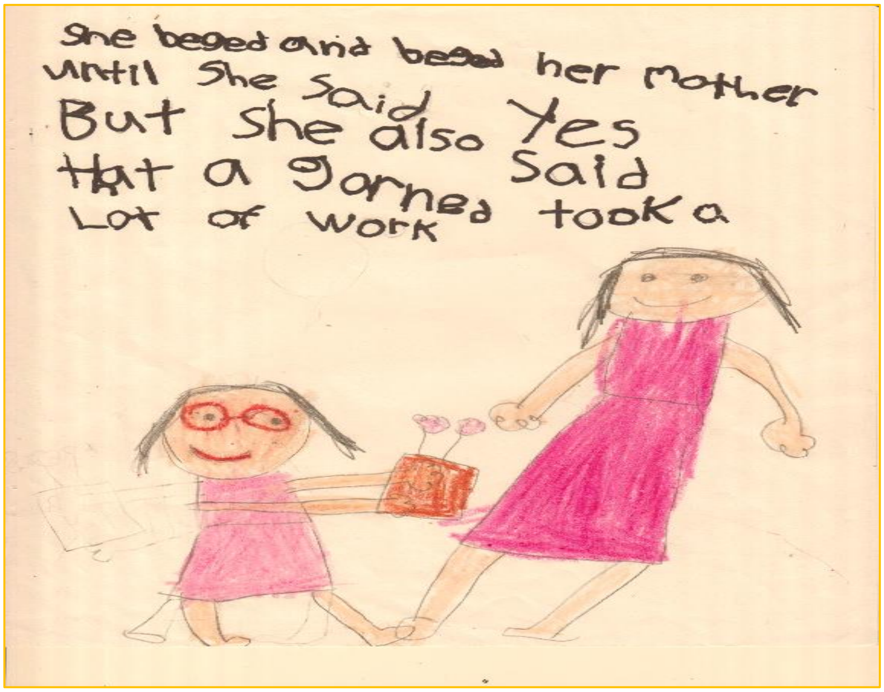
She beged and beged her mother until she said Yes
But she also said that a garned took a Lot of work

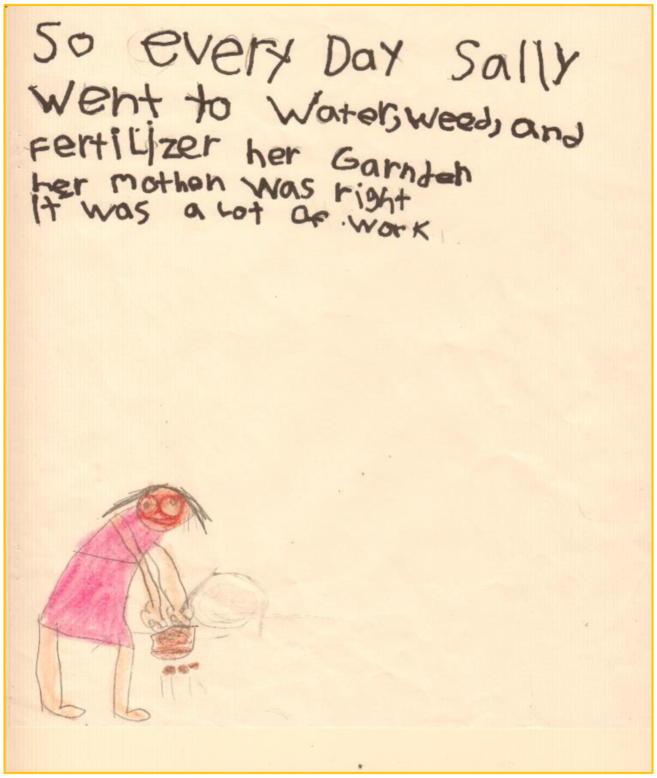

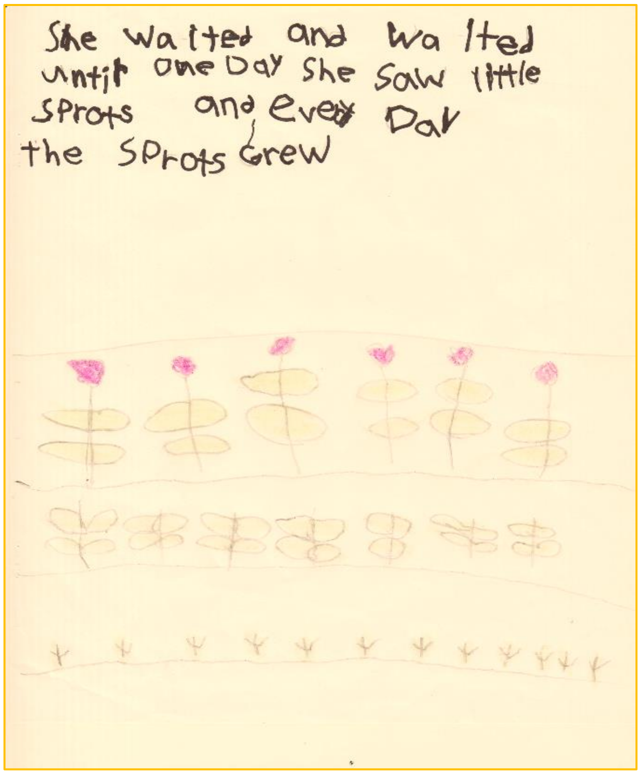

Anya Chatterji

Grade 1

Age 6

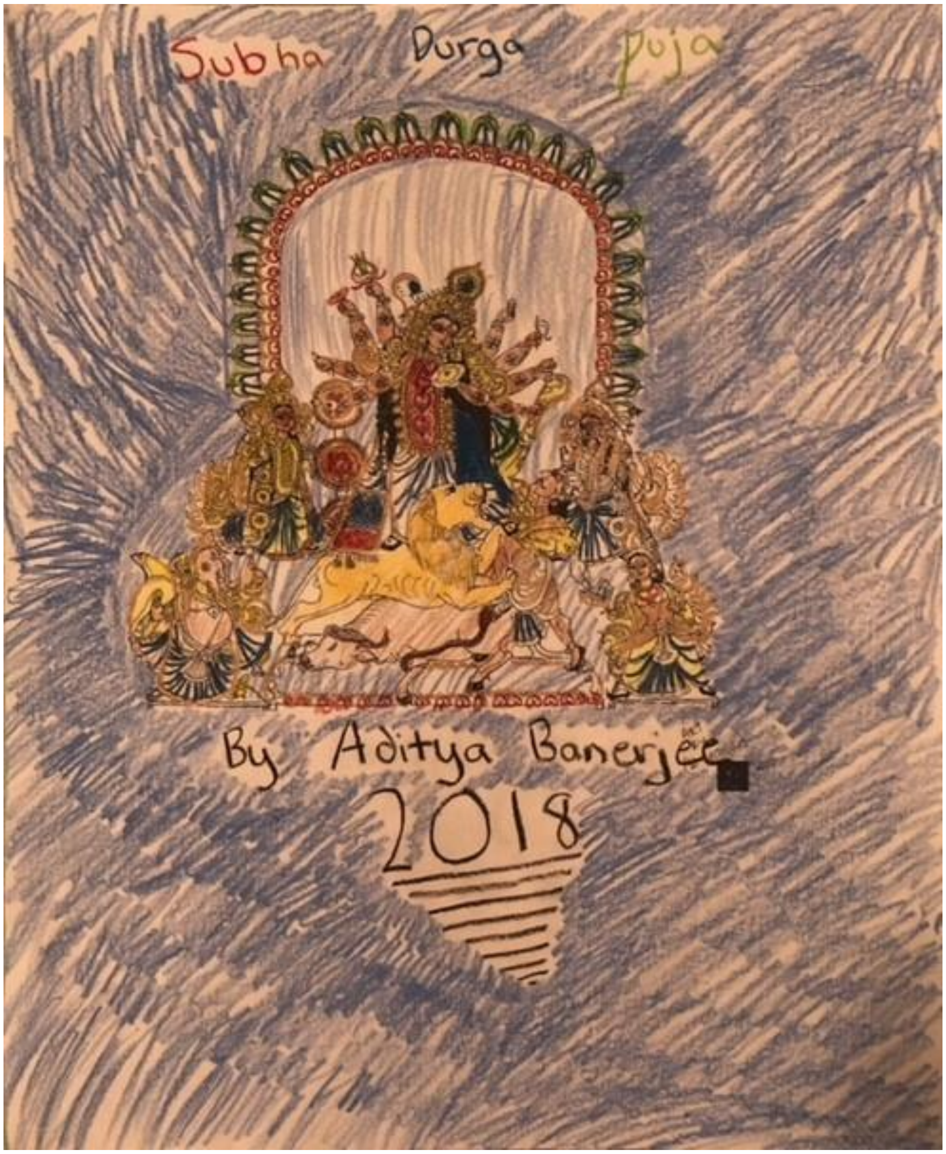

Aditya Banerjee

Grade 6

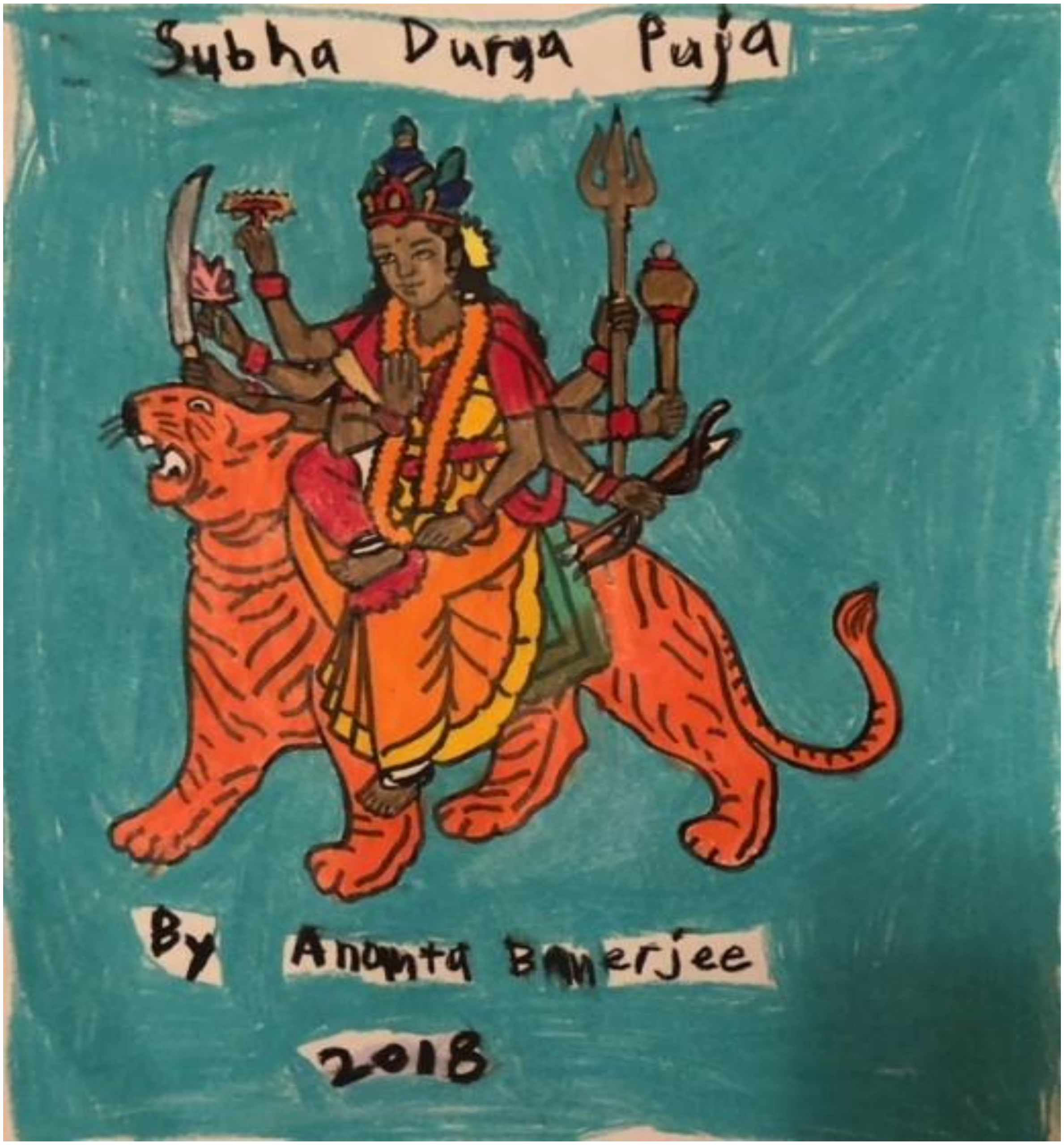

e

Ananta Banerjee

Grade 4

Coloring by Rhea Singh

Grade 5

Drawing by Lisa Singh

Grade 3

Ella Bagchi
Grade 4
Age 9

The Rider

Sureeta Das

Grade 5

Age 9

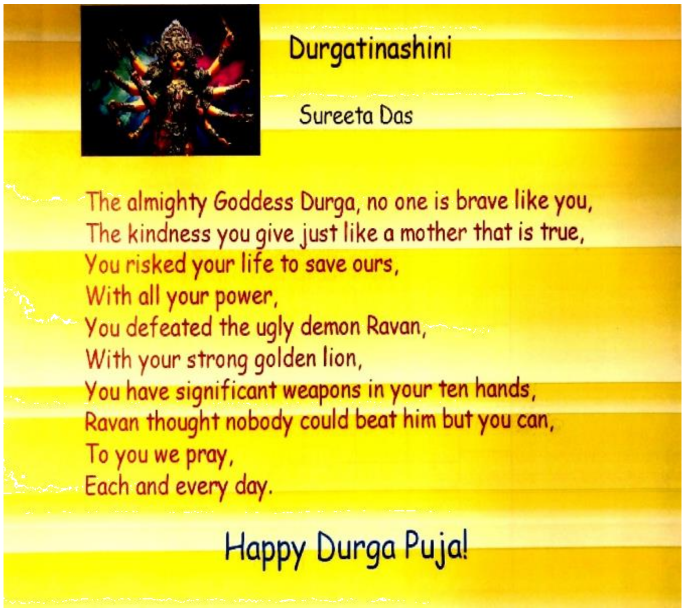

Self Portrait

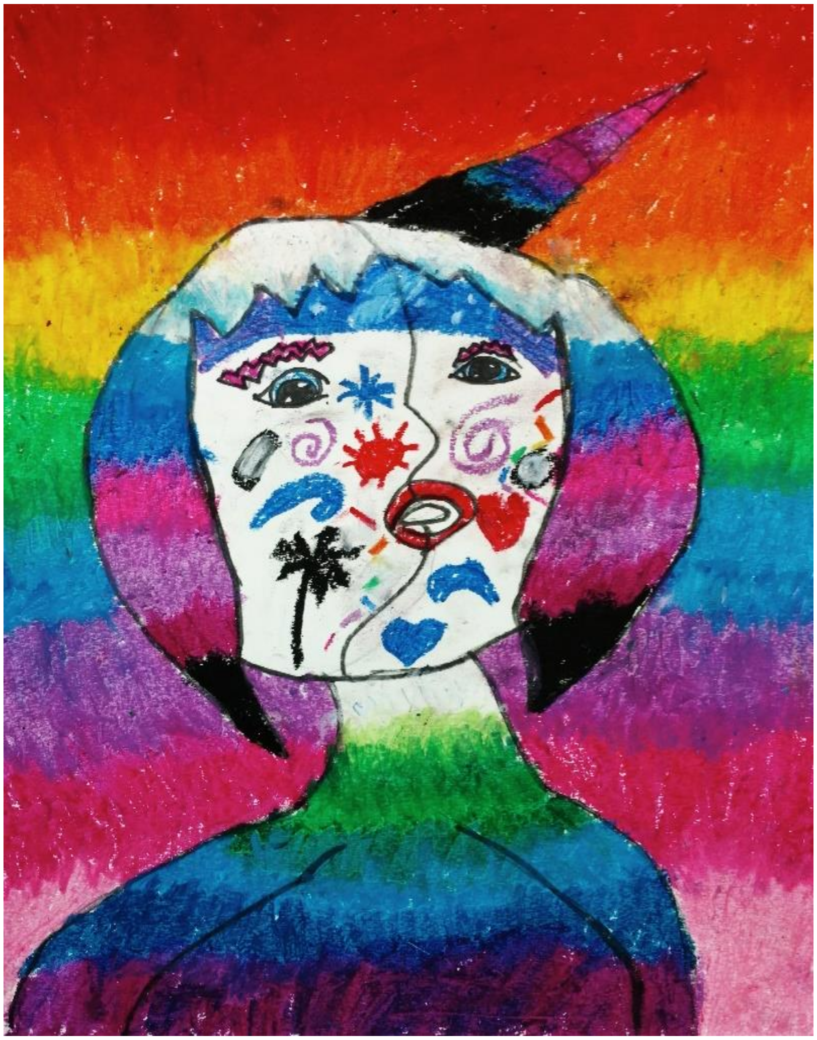

Sureeta Das
Grade 5
Age 9

Arpan Dasgupta, Grade 8, Age 13

Painting

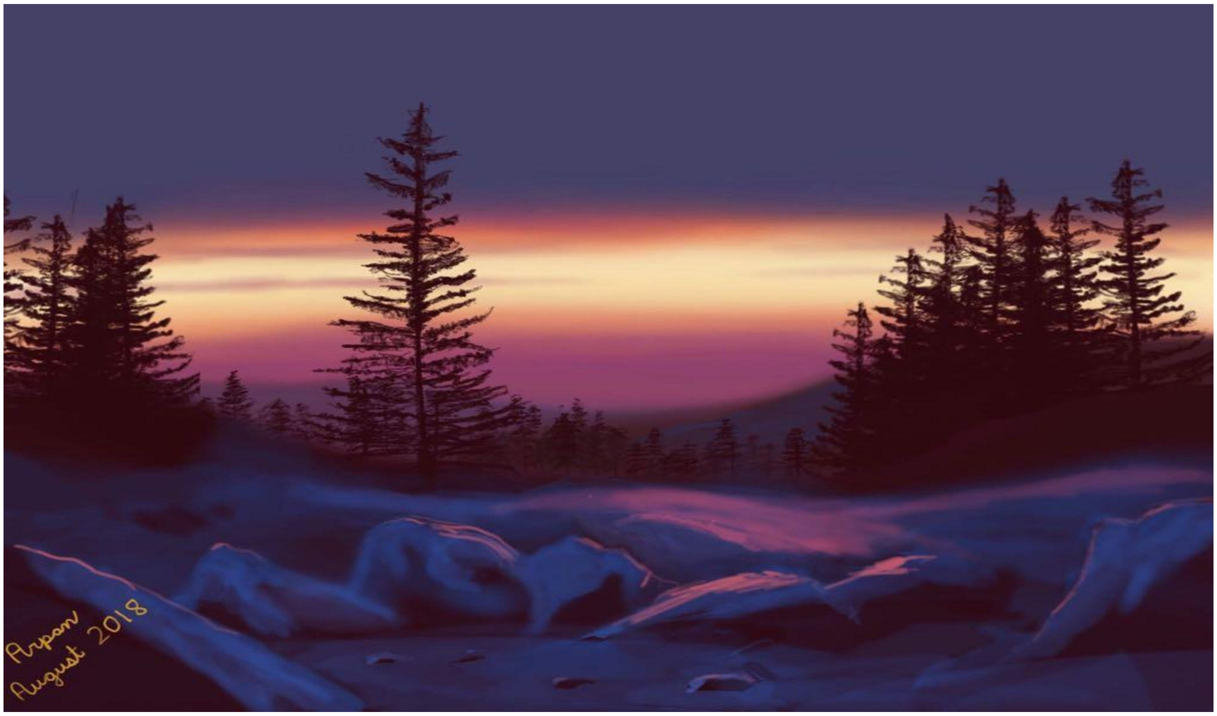

Snowy Sunset

Foggy Mountains

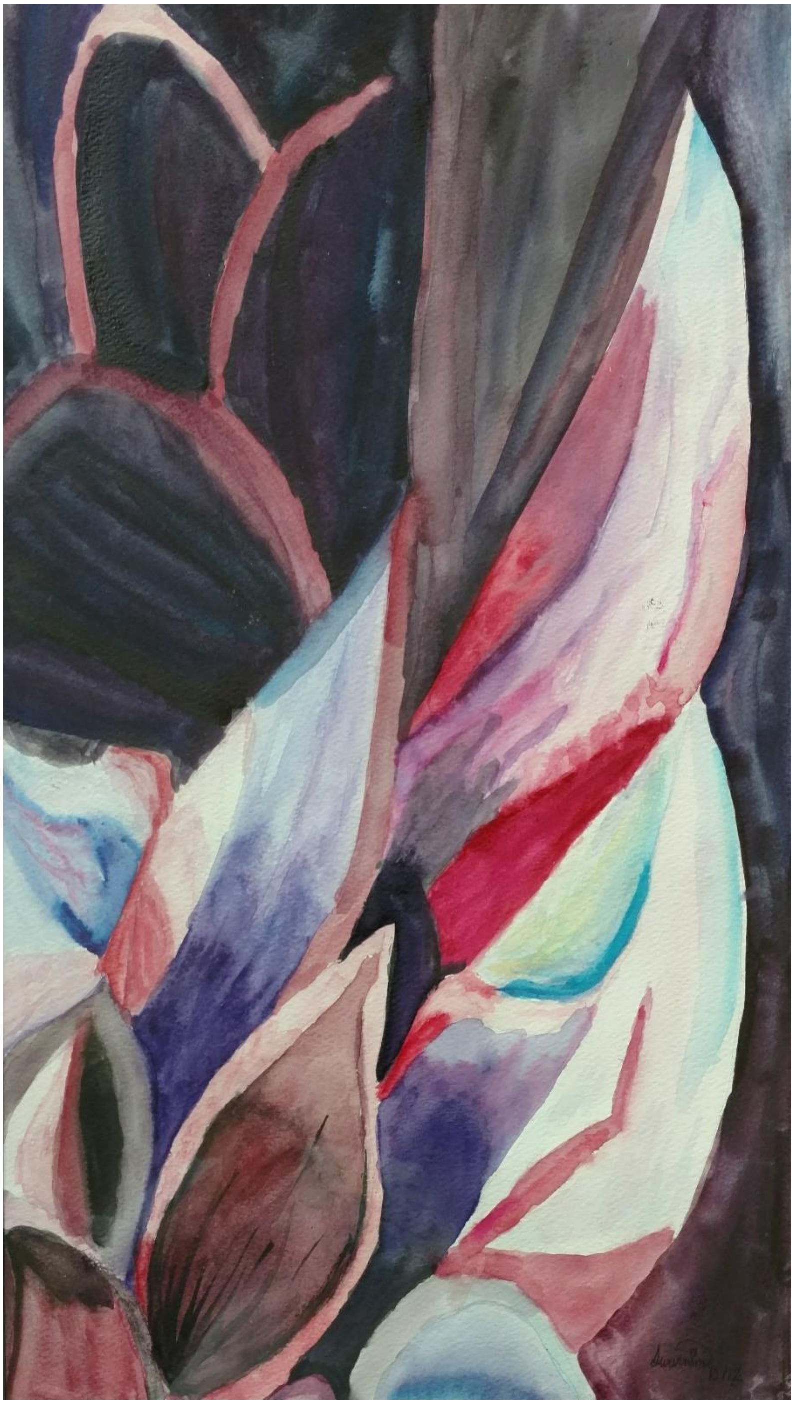

Swarnima Das

Age 19

Painting by acrylic and watercolor medium

Roshni Ray
Grade 12
Age 17

Ganesha

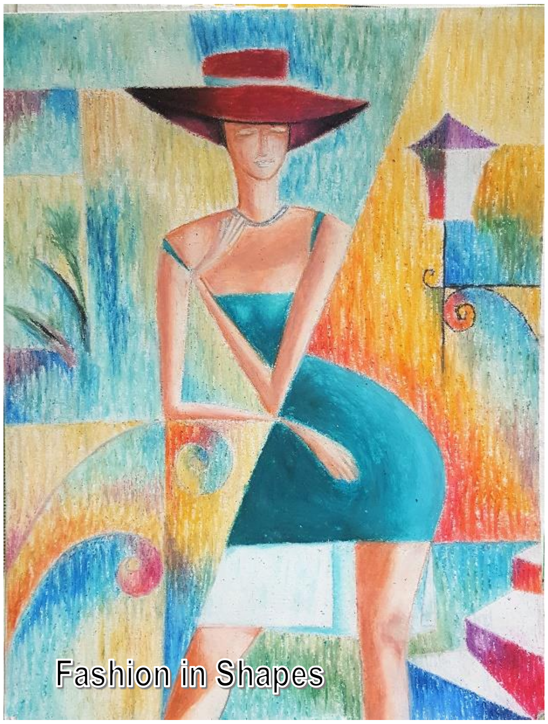
Fashion in Shapes

Evening in Paris

A Trip to a Place like None Other

Sriram Chakravadhanula

My trip to Jaipur and Amritsar was like no other trip. It was a trip of enjoyment, education, and wonder. Living in the U.S, I haven't really learned much about India's great history of happiness and sorrow. So here I will tell you my step by step encounter with everything I did during this trip.

Jaipur

My plane from Hyderabad landed first in Jaipur. Jaipur is the capital of the state of Rajasthan. This is located in the northern part of India. They have very hot summers on cool winters. That is why most palaces have both heating and cooling systems installed. These cooling systems are not like present day A. C's, but they still do their jobs.

Amber Fort

We first visited Amber fort which is pronounced Amer fort. It was surrounded by a 12 km wall. Across from Amber fort is Jaigarh fort which was used as a military station. Amber fort was the living quarters

of the Kings and Queens of Rajasthan. During the hot summers, the fort was usually very hot. So the Architects used a special plaster made from a mixture of limestone, banana, coconut, and marble to keep the fort cool. In some rooms, there is a special cooling system. Water flows around the room in a thin layer and wind blows through it and creates a cool mist. In the winter they use wool curtains to keep the warmth in the rooms.

Sheesh Mahal

Translated to say the Mirror palace the Sheesh Mahal is full of Belgium Convex Mirrors. This makes anything reflect in all mirrors. This is used during the winter to make warmth. A lamp is lit in the center of the Mahal and makes warmth in the room.

City Palace

Jaipur old city is surrounded by 4 gates in a wall. In the middle is a City palace and an observatory which you will hear about later. The City Palace is where the current royal family is living. The royal family runs the tourists cite and gets money from it. The city

The Story

Jaipur was founded by Maharaja Jai Singh II. He built the city in 1927 with the help of an intelligent architect with the name of Vidyadhar Bhattacharya. He built the city to be very organized and secure. His capital was Amber, a 10 min drive from Jaipur. However, Amber was built long before Jai Singh II was born. There was a line of Kings before him.

- Raja Bhagawan Das.

He fought to keep Amber and Gujarat

- Maharaja Man Singh I. Mighty warrior and gained land in Orissa, Afghanistan, and Bengal.
- Jai Singh I.

Won Against the Mughal emperor Aurangzeb and led the Mughal army.

- Maharaja Sawai Jai Singh II
- Maharaja Sawai Ishwari Singh
- Maharaja Sawai Madho Singh II. Sent money to help his kingdom.
- Maharaja Sawai Man Singh II. Considered one of the best kings. He modernized Jaipur as much as

palace is where I saw a very interesting Armory. There were many swords. Some swords had interesting contraptions like a pistol inside a sword and another sword inside a sword. The city palace was also home to a textile museum. I saw heavy dresses for the kings and queens and carpets that were laid out in their living rooms and halls.

<u>Jantar Mantar Observatory</u>

Constructed by Maharaja Sawai Jai Singh II, Jantar Mantar has 19 astronomical instruments to find locations of celestial bodies and constellations over a certain point. There are early forms of Sun dials, Astronomical maps, and dials that tell when a constellation crosses the meridian.

<u>Hawa Mahal</u>

According to a rule, royal women are not allowed to be seen outside the palace and cannot be seen by anybody accept for the servants and king.

So a Mahal was built with windows so that the royal women could watch the market in the street below.

<u>Amritsar</u>

Amritsar is located in the state of Punjab in north western India. It borders Pakistan. Amritsar is home to the infamous golden temple and Jalianwala Bagh.

<u>Golden Temple</u>

Built in the early 19 centuries, the golden temple is made out of400 kg of 22k gold donated by Maharaja Ranjit Singh. The golden temple is a place for Sikhs. But anybody can go to visit to see its wonder.

<u>Jalianwala Bagh</u>

When India was still under British rule, there was a group of Punjabis that were so mighty that they always beat the British in the Independence movement. So when the Punjabis were going to give a speech in a garden with only one entrance, the British under General Dyer closed the gate and shot all the Punjabis and all the villagers listening to the speech. A Sikh however wanted revenge. He traveled the world for 21 years under secrecy and finally reached England and killed General Dyer in his own homeland.

That’s all folks. I was on the plane back to Hyderabad to my grandparents’ place after a long and tiring trip.

Note: This entire trip, full of knowledge and sightseeing with more places not mentioned was completed within 3 days, not counting the flight journey.

Sriram Chakravadhanula lives in vestal NY with his family. He is in 7th grade and has a sister. He took some of the photos you see and took photos from his mom Sushma Madduri.

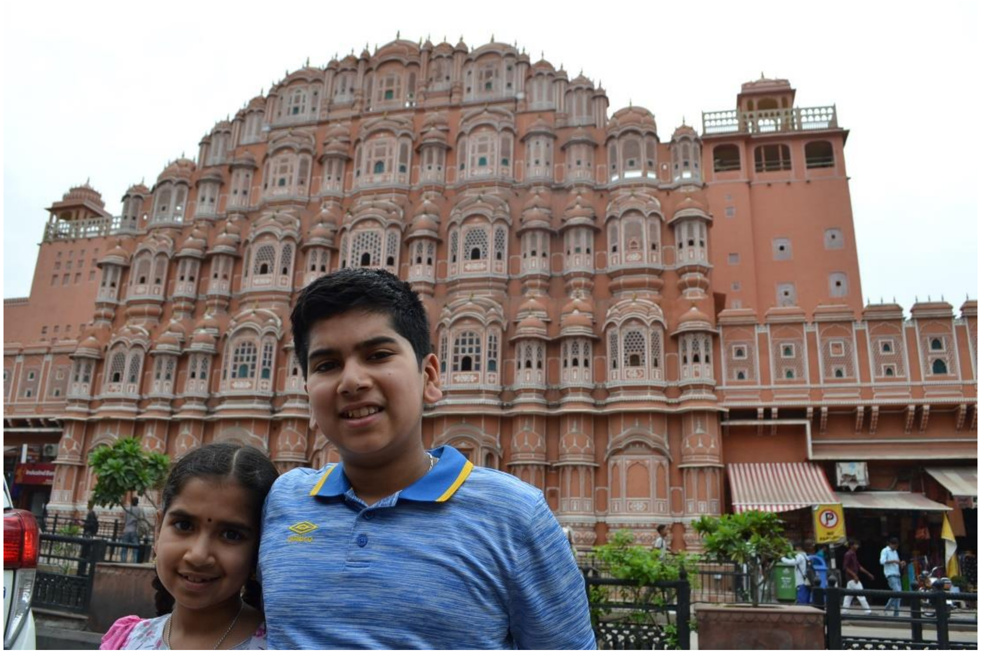

Realization of god

Amal shastri

First, we should know the natural path of realization.

In Raj-Yoga there are eight steps of Sadhana; 1] Yam 2] Niyam, 3] Asan, 4] Pranayam, 5] Pratyahar 6] Dharana[supposition] [7] Dhyana Meditation, and last is [8] Samadhi.

Old saints of India used to go through all the eight steps and they used to reach the last stage of Samadhi.

It is seen, if we, the family- people do only the last three steps we also can reach easily for the last step of Samadhi. if it is adjustable to the ordinary routine of a worldly life. Generally, we do not admit none of the methods of rigid austerity, penance or any physical mortification undertaken with the Indriyas. [there are our 14 senses].

As it is so plain that often for this very reason, it is not so well understood by the people who are under impression that the realization is the most difficult job which requires persistent labor for lives and ages.

It may however be difficult to those who proceed on loaded with their confused conceptions of Reality and adopt complicated means for their achievement.

As a matter of fact, Reality which one aspires for, so simple means alone.

Therefore, for the realization of the simple it is only the simplest means that can ensure success.

It is quite easy to pick up a needle from the ground by means of our finger but if we apply a crane for the purpose, it may impossible. Exactly same is the case with Realization.

The confusing methods and complicated means advised for the realization of the simplest do not therefore serve the purpose.

Rather, they keep one entangled in her/his self-created complexities all the life. As a matter of fact, Realization is neither a game of contest with the nerves and muscles nor a physical pursuit involving austerity, penance or mortification.

It is only the transformation of inner being to its real nature.

It is for every living soul to wake up to her/his spiritual needs for the realization of the Ultimate.

We belong to the country where religious spirit has never been flowing in or the other form. Diverse means are adopted for gaining the object of life. They may be correct if the heart is connected with it. In the real sense, to be absorbed in the essence of real life. We are bred to have union with reality which have emerged from.

We have brought with us the very essence of infinity and we try to keep close to it, to give freedom to our thought for absorption in the Infinite. If we neglect it, we remain bound to activity of thought, and not to the reality at root of which is limitless.

The hymns and prayers offered generally result in flattery when one is Dumb to the real spirit of the essential character.

The great teachers have always been actively speculating to devise means and methods of higher approach, though the solution is quite at hand.

Really the path near to ourselves is the path nearest to God.

The service to humanity in this respect by providing easiest means of gaining the objects of life. The methods are so easy that their very easiness has become a veil for common understanding.

Simple and subtle means are needed for the realization of the subtlest being. All these days, Realization has been represented as a very difficult and complicated job. This offers great discouragement to the people who are there scared away from it. Such ideas should be banished from the mind, for they weaken the will which is the only instrument to help us on our onward march.

Based on our experiences, it is a very simple process which can be followed by all quite easily. If one can sell her/his heart i.e., make gift of it to the Divine God, hardly anything more remains to be done.

This shall naturally bring her/him to the state of absorbency in the infinite Reality.

The adoption of this easy and simple technique makes the beginning of the process the very end of it. The impulse begins to flow automatically transforming the entire being of an individual. What else except a tiny heart can be fittest offering for the achievement of the dearest of life?

One thing more: to affect the surrender of heart in the easiest way, only an act of will is required. But lighter and finer the will, the more effective shall be in its working. The act of will lying in the form of a seed of an insignificant volume in the deeper cores of consciousness, shall soon develop into full-fledged tree stretching its branches all over.

Finally, the adoption of the methods is sure to bring in an attitude of renunciation from the first day. A courageous start is all that is needed for the purpose.

May the true seeker see the light and wake up to the call of her/his real self.

Let close with a prayer for the inner awakening of all living being to the real life.

Acharya Amol Shastri completed his Masters Degree on Astrology from Maharaja Sayaji Rao University. Shastriji has studied Bhagwat Gita, Ramayana and Mahabharata extensively and during discourses, he has elaborated the inner and spiritual meaning of the Hindu scripture in various temples of USA and in India. In his words, 'Gita is a vast subject and is a guide for any one irrespective of caste, creed or religion'. Acharya is Yoga practitioner for last 30 years and has a center at home, in Vestal, NY.

Mysore Palace

Archana Susarla

The Ambavilas Palace, also known as the Mysore Palace, is a historical palace and royal residence in Mysore, Karnataka (Mysore Palace, 2018). The palace is in the center of Mysore and faces the Chamundi Hills. Mysore is known as the city of palaces and is referred to as the old fort. Other than the Mysore Palace, there are seven different palaces in Karnataka (Mysore Palace, 2018). The land where the Mysore Palace is located was once called Puragiri (citadel) and is now known as the Old Fort. The first was built in the Old Fort by Yaduraya in the fourteenth century. However, it was demolished and rebuilt multiple times. The current building was constructed between 1897 and 1912 and is now one of the most famous tourist attractions after the Taj Mahal, attracting six million visitors annually (Mysore Palace, 2018).

Architecture- The Mysore Palace is indo-saracenic (chiefly mosques and tombs with decorated surfaces, bulbous domes, pointed, and multi-foiled arches) and contains Hindu, Mughal, Rajput, and Gothic styles. The palace has marble domes and a five-story tower that is one-hundred forty-five feet high. The Mysore Palace has a large garden, entrance gate, and an arch (Mysore Palace, 2018).

The main complex is two-hundred forty-five feet high and one-hundred fifty-six feet wide. The Mysore Palace has three entrances: The East Gate, The South Entrance, and the West Entrance. The East Gate is opened only during Dusshera and for dignitaries (people holding a high rank in office). The South and West Gates are open for the public. The Mysore Palace has numerous secret tunnels from the cellar to the Srirangapatna (town in Mandhya District in Karnataka), other palaces and confidential areas (Mysore Palace, 2018).

The Mysore Palace is made up of fine gray granite with deep pink marble domes, has several large arch's and two smaller one's holding the central arch, which is supported by tall pillars. The sculpture of Gajalakshmi, is in the central of the arch. Lakshmi is the goddess of wealth, prosperity, fortune, and abundance with her elephants. The temple has three buildings within the old fort and eighteen inside the Palace Heart Building (Mysore Palace, 2018).

The Mysore Palace has four major unique rooms: The Golden Throne, the Ambivalasa Dhar-e-kas (private hall), Dolls Pavilion (Gombe Thotti), and the Kalyana Mantapa (marriage hall). The Golden Throne of was the Royal Throne of the Rulers of the Kingdom of Mysore and one of the main attractions of Mysore Palace. Dasara is the only time it is open for public viewing (Mysore Palace, 2018).

The Ambivalasa was once used by the King for private audiences. The entrance is a rosewood doorway, decorated with ivory, opening into a shrine (holy place because of its association with divinity or a sacred person) dedicated to Lord Ganesha. The central nave (central part of the church, intended to accommodate most of the congregation) contains ornately gilded columns, stained glass ceilings, decorated steel grills, and chandeliers with fine floral motives, in the pietra dura, in addition to precious stones (Mysore Palace, 2018).

Kalyana Mantapa- The Kalyana Mantapa is an octagonal shaped marriage hall with multi-colored, stained glass ceilings and peacock motives arranged in geometric patterns. This structure has an old-fashioned past that originated in Scotland (Mysore Palace, 2018). The floor which is made of a peacock mosaic, (picture pattern produced by arranging together small, colored pieces of hard material, such as stone, tile, or glass) is made from tiles made in England. Oil paintings displaying the royal procession during Dasara are on the walls (Mysore Palace, 2018).

Temples- The Mysore Palace consists of four major temples. The oldest temple was built in the fourteenth century, and the newest one was built in 1953. Some famous temples in the Mysore Palace are: Lakshminarayana Temple, dedicated to Lord Vishnu and the Sri Prasanna Krishna Swamy Temple, dedicated to Lord Krishna. The Sri Bhuvaneshwari Temple is dedicated to Goddess Bhuvaneshwari. The Kodi Someshwaraswami Temple is dedicated to Lord Shiva. The Sri Gayathri Temple is dedicated to Goddess Gayathri and the Sri Trinseshwara Temple is dedicated to Lord Shiva (Mysore Palace, 2018). On Sundays, holidays, for forty-five minutes in the evening, and all ten days of Dusara, the palace is lit. On Sundays, there are programs for forty-five minutes in the evenings. The old fort is open all days and evening and is very well protected. The Mysore Palace also hosts six other royal palaces: The Jayanmohan Palace, JayaLakshmi Vilas Palace, Rajendra Vilas Palace, Lalita Mahal Palace, The Cheluvamba Palace, and the Krishna Rajendra Vilas Palace (Mysore Palace, 2018).

The Jaganmohan Palace is A Temporary Royal residence, later used by Maharaja Jaya Chamarajendra Wadiyar, as this is his art gallery. The Jaya Lakshmi Vilas Palace is a folk-art museum, maintained by Mysore University. The Rajendra Vilas Palace is a private hotel on top of the Chamundi Hills. The palace was used as a guest palace by the Maharaja's during their visit to the hills. The Lalita Mahal Palace, now a five-star hotel, was once used as a palace for British envoys and governors (Mysore Palace, 2018).

The Mysore Palace is beautifully constructed, with several unique rooms and temples, as well as seven different palaces, making it one of the most beautiful tourist attractions.

Reference

Mysore Palace (2018). Retrieved from

https://www.en.wikipedia.org/index.php?title=mysore_palace&oldid-844811469.

Retrieved on June 7, 2018.

Archana Susarla lives in Vestal, New York. She is a graduate of SUNY Oneonta with a BS in Psychology. She works with Alzheimer's patients engaging them with social activity and memory stimulation.

I survived...!

Sushma Vijayakrishna

When I came across the 'I Survived...!' book series in my son's school library, I was disturbed at the very first sight of seeing them. As my son approached the shelf, I quickly turned my head and pretended to not pay attention. He started to talk about them, and I distracted him.

At a much later date, I came to know that he was actually borrowing those books and working on them as part of his reading exercises and book-report projects. It's probably not a big deal, however these books have real people narrate their experiences of high-level crisis and their survival from them- to quote a few dramatic ones that include kidnaps, traps and near-death incidents.

Not till recent times, did I learn that this was even an original Television series. As a typical parent with protective shoes on, I wasn't thrilled at the idea of these books being available in the elementary school library. I thought it was an added trauma on their young minds and an additional 'no-sense' discussion at the dining table! I condemned my son from reading these books and in a rage of anger/frustration returned the books to the library right the very next day they came home. He was certainly shocked at my action and reaction!

Two months later, on a rainy winter evening, I was driving my kids home from a doctor's appointment. I was tired from a long day at work, in addition to have taken care of a sick child for three sleepless nights in a row. I was playing 'Super Mom' that evening in the driver's seat – trying to drive, google the nearby pharmacy, turning my head around and checking on the sick kid in the rear seat etc..

In a split second, a huge truck passed by my car and I missed it very narrowly! The truck was large enough to not fit into a blind spot, and the rain somehow didn't help in any way!

My heart raced up to may be 200 beats – and I could feel my forehead wet with fear. I tried to swallow my heart down my throat- that popped into my mouth from the shock. ASAP, I pulled the car onto a shoulder, got out of my seat, opened the rear door and hugged my kid tight in a protective reflex! The truck just passed by the same side of the car as my kid's door. God knows what could have happened! Did I just… S..U..R..V..I..V..E?

For some unknown reason, I had a flash of a good old memory in my mind's screen that moment. Another incident I recalled from the past in which I survived from an accident.

Rajalingam – our auto rickshaw driver would sound his 'balloon' horn (that's what we called it!) at 8 am sharp every morning as a signal for getting out to go to school. He would give us rides back and forth between home and school and this probably happened for about 5 to 6 years. Mom paid him a monthly fare for this expedition. The 8 am signal was some sort of a military discipline and we would literally jump into the auto rickshaw in all sorts and shapes!

That said- one of us would still be biting on our half-finished idly with sugar crystals dropping all over the floor all the way from the dining table to the auto-rickshaw leaving a trail of red-ants behind to finish up the rest..(forget the chutney!), one of us probably had one shoe on- and the other in the hand; one of us was probably forgot our homework on the dining table right next to the water pitcher and would be looking out for amma to put it away in a safer place!, and would start crying for forgetting to announce that, and one of us would haven't had our hair braided by then!

Lingam never looked back to fix any of our 'haalath' and would just get ready to lift up his kick rod (the long one) and start the auto-rickshaw!

His only goal every morning is to get past the railway crossing at Jamai Osmania junction about 7 minutes away from my place. This railway crossing like any other would have its own range of unpredictable schedule issues- accommodating each and every train running late for the day. Hence it was vitally important for us to cross this gate before the first appointed train at about 8:10 AM. Several times we missed this deadline and hence ended up enjoying a 'jhoola' treat each time on the railway crossing gate!

One Saturday afternoon on our way back home- we crossed this gate and were heading to our first drop off location. We felt a sudden jerk and before we could react the entire auto rickshaw fell to the side bringing us all one on top of the other. There was a split-second silence followed by chaos as a reaction. Few folks came running to lift up the automobile into its original position making us all settle back in-place like

matchsticks in a matchbox. Some of us sitting towards the outer end sustained small injuries like scratches and bruises, while the others sitting towards the center were completely safe. I instantly searched for Lingam, and saw him yelling at nearby folks to arrange for another auto to take us home. He pointed to a nearby acquaintance to help him drag the auto to a nearby garage for repair.

I had no clue of what just happened- however remained silent till I got home. My maternal great-grand mother was home at that time and came out to receive us and of course was upset by the sight of clumsy attire. I quickly went in and put away my things and eagerly jumped behind the front room curtain to hear what Lingam was to report.

Clearing this throat, he said, “Amma- nothing to worry-! My auto-brake failed- and I intentionally collided with a nearby closed shutter to avoid head-on collision with an on-coming lorry! All the kids are safe by God’s grace. Please give the kids some warm milk to calm them down from the shock. I have to attend to some minor repairs on my auto by Monday for the usual ride. I’ll see you later!”. And then he left.

I had my jaw drop for what he just said. I understood what we survived that day! Kudos to our Baahubali- our very own dear RajaLingam!

This flash memory taught me a small lesson that evening. I think kids ought to be taught about such situations and explained how to respond as a safety drill (may be not the dramatic way but a more natural way!).

I am a teacher by profession and an ardent lover of nature by heart. I strongly believe that our very being is always influenced and improved by observing two important facts of life: Mother Nature and People!

Sita Ramachandra Swamy Temple

Archana Susarla

The Sita Ramachandra Swamy Temple is in the town on Bhadrachalam in Telangana state. The Sita Rama Tirukalyana Mahotsavam (marriage of Rama and Seeta) is the biggest festival, celebrated annually. Other festivals celebrated here are include Vaikunta Ekadashi, Vasanthotsavam, and Vijayadashami (Wikipedia, 2018).

The Temple

The temple has three parts: the 1st part is the head of the Bhadra where the Shrine (holy building marked by divinity or its association to a sacred person) is dedicated to Lord Shiva. The footprints of Rama can be seen inside on a rock structure. Thirunamam (white clay) is applied to the rock so visitors can recognize it as Bhadra's head. The second part of the temple is a sanctum (sacred place within a temple or church) where the central icon resides on a place considered equivalent to Bhadra's heart. The third part is the Rajagopuram (main tower) located at the Bhadra's feet. The temple has four entrances and fifty steps to climb to reach the main entrance (Wikipedia, 2018).

Religious Practices

The Sita Ramachandra Swamy Temple follows all traditions of the Sriangam Temple dedicated to Ranganatha. Narasimha Dasu (person who looked over the temples rituals) introduced Dasavid Lotsavams (ten kinds of rituals including Nitya Kankaryams (daily rituals), Vaarotsavams (weekly rituals), Pakshotsavams (fortnightly rituals), and Punarvasu Utsavam (rituals on Punarvasu days). Punarvasu, derived from puna and vasu, refers to return, renewal, restoration, and repetition. The Supabhata Seva (pre-dawn) ritual begins at four in the morning, followed by bhalabhogya (minor food offerings from 5:30 to 7:30). From 8:30 to 11:30 in the morning, Archana prayer activities are held. Rajabhogam (main food offering) is served from 11:30 to noon. The temple closes at noon and re-opens at three pm. Archana rituals continue where the darbar seva (King's court ritual) is performed from seven to eight in the evening. Abhisheka (anointments) is the main performance at Rama's feet on the rock structure. The ritual is also performed to Lakshmi, Anjaneya, and Yogananda Narsimha every Friday, Tuesday, and Saturday. The temple has weekly, monthly, and fortnightly rituals. The Kalyanam (marriage ritual) and Thiruveedi Utsavam (procession festival) are performed at the Ranganayakula Gutta annually for Ranganatha

Festivals

The Sita Ramachandra Swamy Temple celebrates four major festivals as well as other small festivals. The four main festivals celebrated here are Vaikuntha Ekadashi, Vasanthosavam, Brahmotsavam, and Vijayadashami. The Bhadradri Kshethra Mahatyam (importance of Bhadradri) in the Brahma Purana, devotees seek blessings from Viakunta Rama. The Teppotsavam (float festival) is celebrated where Hamsarahanam (swan-shaped boat) is sailed across the Godavari River. Teppotsavanam is held at night below electrical lights and fireworks. On the day of Vaikunta Ekadashi, Rama, Sita, and Lakshmana are seated on the Garudavahanam (garuda- bird with a mixture of eagle and human features) (vahana- vehicle) and devotees pass through Vaikunta Dwaram (gate to Vaikunta Ekadashi). The Goda Kalyanam (festival celebrating the marriage of Lakshmi Devi with Sri Krishna) and the Rahotsavam (chariot festival) form other

main activities that are important in the twenty-one day long celebration. Vaikunta Ekadashi coincides with Maha-Sankranti festivals (Wikipedia, 2018).

Vasanthotsavam- Vasanthotsavam is the festival of spring and marks the commencement of preparations for the annual Brahmotsavam (grand celebration) festival. Vasanthotsavam coincides with Holi and includes the preparation of mutyala talambralu (talambralu-made of pearls). Talambralu is a mixture of rice and turmeric used in South- Indian marriage rituals. Natural pearls are mixed with rice, grains, and the husks are removed with nails and turmeric powder. This mixture is made by hand and is known as Goti Talambralu (talambralu polished by nails). Rama is decorated by using nine blocks of turmeric powder and other ingredients. The water used in this process is called Vasantha Theertham. The water is sprinkled on devotees who then celebrate Holi Dolotsavam (spring ritual), is performed to conclude Vasanthotsavam by placing the icon on a golden cradle and singing lullabies.

Brahmotsavam- The Brahmotsavam is the chief festival of the temple and is celebrated for twelve days during March and April. Rama Navami (birthday of Rama) is the main event. Rama's marriage to Sita was held on this day. The Brahmotsavam festival is also known as Sri Sita Rama Thirukalyana Mahotsavam. Vijayadashami is a ten-day festival celebrated in Bhadrachalam. People read the Ramayana for ten days during the Festival of Yagna. The key events of Dussehra are: the marriage of Rama and Seeta followed by prayers to his weapons. After the completion of Yagna, Ram is dressed like an emperor and is carried out in a procession on the vehicle Gaja (elephant) and Aswa (horse). Ram's conch (the roof of a semi-circular apse (semi-circular or polygonal recess in a church), (shaped like half a dome), disc, bow, and mace (heavy club having metal head and spikes) are used as part of the worship. Arrows used for power that belong to Indra, Yama, Varuna, and Kubera are also part of the worship. The events with the Ramlila ceremony are conducted at night (Wikipedia, 2018).

Other prominent festivals celebrated in the Bhadrachalam Temple are Hanuman Jayanthi, Sabari Smruti Yatra, and Dhammakka Seva Yatra. Members of the local tribe wear distinctive head gear and clothing. People sing and dance to the drum beats and display their archery skills. The main event of Dhammakka Seva Yatra is the marriage of Govindaraja Swamy and his consorts (companion) (Wikipedia, 2018).

Performers offer flowers to Dhammakka's statue. They offer Thalambralu in addition to flowers, fruits and perform traditional dances. Apart from these festivals, the Jayanthi Vasavam (birthday) of Gopanna Narasimha Dasu are celebrated annually (Wikipedia, 2018).

The Sita Ramachandraswamy Temple, located in Bhadradri Kothagudem District in Telangana, has many religious festivals dedicated to Lord Vishnu. The Sitarama Thirukalyana Mahotsavam (marriage of Ram and Seeta) is the biggest annual festival celebrated in this temple (Wikipedia, 2018).

Reference

SitaRamachandraswamy Temple, Bhadrachalam. (2018). Retrieved from https:/en/Wikipedia.org/w/index.php?title=sita_ramachandraswamy_temple_bhadrachalam&oldid=845279403. Retrieved on July 2, 2018. (Wikipedia, 2018).

A Fractured Globalized Family

Nita Mitra

In this article, I wish to share my thoughts on what I am going through at the fag-end of my life. My husband has departed from this world for quite some time. I have a son and a daughter. My son lives in America with my daughter-in-law and my loving grandson. My daughter who used to share my nest has flown away to work in Bengaluru. Because of these changes, I am now required to navigate my life on my own. I find this to be quite stressful. I ask myself if I am losing control over my destiny. This stress is leading me towards depression. I can hardly sleep day or night. I feel scared of how my last days will end. Will I be confined to bed? Will I lose all abilities to speak and take care of the daily routine of brushing my teeth or going to the toilet? Who will look after me at this stage? This fear seems to be crippling me.

However, until now, I go for my morning walk and meet my exercise class associates. Once a week, I still go to the Pensioners' Association of Calcutta University, where I had worked for some years, as Professor of Economics. I retired with some satisfaction of having done my job reasonably well. I go to visit my son in the United States and my niece in the United Kingdom. I also visit my daughter in Bengaluru. This brings a lot of variety in my life. These joys break the monotony and refresh me. I visit my other niece, her husband and their two daughters who live in my own city of Kolkata. They make me feel most welcome. On occasions they humor me. Sometimes they speak out against the way I might conduct myself. These things take away my loneliness. I consider myself blessed! I also meet and interact with my old college friends both in India and America. I feel thankful to God for all these enriching experiences. The sum of having a fractured family and scattered friends, indeed brings me a lot of happiness.

I do not envy others who have a well-knit family and a close circle of friends living nearby. They may lack the freedom to move about the world as I do. They may be confined to one place, for instance due to the necessity of tending to their grandchildren, taking them to and from their schools, private lessons, extra-curricular activities, and so on. There are others who must live in abusive relationships, characterized by drug abuse, domestic violence, and the like. Unlike me, there people have neither the freedom nor the agency to control their own lives.

Therefore, the moot question is this: Is a fractured, globalized family like mine better or is a tight-knit family with all members living in proximity better? The answer is indeed complicated, and I suspect it depends on the personality. I leave it to my readers to find their own answers to the question.

Nita Mitra is a Former Professor of Economics
University of Calcutta. She now lives in Kolkata and loves to travel & read.

Dreams

Bulu Dey

The dream came back again. Whenever Nina tries to sleep, not too late, but tired, the dream comes back. It really does not disturb her. She kind of likes the people she sees. She can't recall their names but faces…she doesn't find them strange, but strangely familiar. In fact, she would love to spend some time with them in her waking hours, but she knows it was not possible.

The house was also familiar, but she knows she had never seen it. She sees them from the door way, from across the courtyard. The eldest of them, the *Thakurma*, the lady in white *Saree,* sitting on the cemented floor. There was such a sweet, benign smile on her face, the assurance seemed to travel to her physically. ...!! There was another woman, sitting and braiding a younger woman's long black hair...The shadows of the falling dusk was making it difficult to see their faces. They were talking in low voices. Nina could not hear anything but the murmurs. She tried desperately to catch the *bahu's* eyes, wanted to strike up a conversation. But they just wouldn't meet her eyes.

She remembered the high-water container, with crystal clear water, now dark with the evening shadows.

Has she come here as a child? Has she played around on this courtyard, then who with?

She knew through the open door if you entered the main house, there would be a darkish staircase. The bannister, smooth with use. She still could slide down the stairs. Though she herself is 60 now. Then the women, how come they are still so young even now.? Some things are not quite adding up.

Suddenly the quiet harmony was shattered by a high-pitched sound of conch shell...Nina shivered. It was getting cold...The air suddenly filled with the smell of incense. She took a deep breath. It's only Sandhya, the evening ritual of Sandhya Pradeep.

Nina turned in her sleep. Told to herself, I must reduce the AC. But did not get up.

She took one step forward but stopped. The old lady got up in alarm...panic-stricken but did not look at her. Nina took the other step, hoping the younger ones would look at her...but the atmosphere changed.

The air, filled with acrimony, some male voices, arguing loudly, not to be seen though... it's almost dark. I must turn back. Nina thought. She looked out for her car...but how would her car enter this narrow gully? And this by lane, although people are hurrying home now, each to their home, no cars were there...

Nina now started to panic. How is she to get home? Her cell phone could not connect to her driver.

Nina woke up with a jerk...She couldn't make out where she was...the familiar bed room, the large mirror by the side of the bed...the bathroom door…She gingerly took a step down and entered the bathroom, flooded with light...the beautiful lines of the tiles...bathed in light ...she steadied herself by holding the counters. And as every day, looked at herself in the mirror. The woman looking back at her looked vaguely familiar...the one braiding the daughter's hair? Nina looked at her. The woman returned her look, unfaltering, steady gaze, holding Nina's eyes...and that's when the sharp chest pain hit her....

Nina now took two more steps and crossed the threshold. The courtyard was semi dark. The open-door way, leading to the inside of the house, exactly the same as she pictured in her mind. There were rooms both sides of the staircase. The acrid smell of cooking greeted her.... some tempering or the other...Nina now felt quite at home...Though nobody was there to greet her...she felt their presence. Behind closed doors. Voices, and hurried urgent steps...someone is ill in one of the rooms. Terminally ill. Which room, Nina started climbing the stairs. First floor was high...so many stairs, she held on to the bannister, the same smooth feeling of the past...Which room?

Suddenly the women and three men were there. In front of a door, on the head of the stairs. Same clothing as yesterday. The bahu opened the large door, Nina walked in, as if on a queue. A sick bed...some nurses hovering around the bed. The bahu looked at her...same steady gaze. Nina looked around. She was not at all surprised to see that the room was her own very bedroom. The bathroom door lay ajar, just as she left it. It's her own bathroom. She looked down at the empty bed, there was only one thing for her to do...She quietly but swiftly lowered herself on the bed and laid down....

Bulu Dey lives in New Delhi, India. She is a retired manufacturer / exporter of lady's special occasion dresses. She has always been interested in colors and creative things. Growing flowers is her passion.

The golden opportunity

Aditi Ganguly

At last we shifted to Feroze Shah Rd, hutments. Lots of friends and a huge ground to play. Baba gave the flat a rose garden and more privacy. I used to go around the hutments in search of friends who don't come to play. I found her in one of the flats a quiet, demure looking and sad eyed. She said she lived with her *Jethima* after her mother and father died in an accident. I was devastated she was seven or eight years old while I was about ten.

I felt drawn to her - little things like sweets, biscuits I used to preserve for her. While she ate I talked to her *Jethima*. She also took a liking for me.

Jethima liked achaar (Pickles) and I stole some out of *Amma's* hideout. Gradually our friendship flourished, and she was allowed to come to my house. I had a doll's house which was filled with bathing tubs to almirahs. When my friend saw the house, her eyes glowed up with joy and she peered into every nook and corner to enjoy the thrill and excitement. I asked her how many doll's she had. She kept quiet. I realized my mistake and said I will get her some toys.

Our school celebrated Christmas and gave us gifts. As I had done well in my exam mother called me and asked me what I wanted. I said a boy doll.

On Christmas day I unfolded my parcel and received the most beautiful boy doll I had ever seen. Years later my elder son was born on Christmas day. My friend murmured on seeing my gift "you are very lucky ".

My friend's sad plight sometimes wanted me to buy her toys but money from parents in the post-Independence period was a rare item. So, I thought about a plan. I would her my old dolly and have a doll's marriage complete with dinner served at our house.

Dinner invitations were made, and each invitee came with a gift from brooches, chips to household items for the dolly's. After the wedding although as per ritual I would inherit everything …I intended to give everything to my friend.

When my other friends heard this, they called me a fool to give away all the presents and other things. Little did they that I was waiting for this golden opportunity to give her a chance to play with toys.

When I rushed back home after giving her the toys and jumped into the arms of my mother and sister & grandfather. I knew I had done right … there is more pleasure in giving than taking.

Aditi Ganguly lives in Kolkata. She is a Mother, and a grandmother. She derived her emotional strength and confidence from the teachings of her eminent professors in college and Irish dedicated sisters in school. Aditi has friends all over the country and abroad. She loves to live. Writing is her hobby

Tirupati

Archana Susarla

Tirupati is a city in the state of Andhra Pradesh. Tiru means "sacred" and pathi means "husband". The population of Tirupati was 374, 000 in 2011, making it the most heavily populated city in Andhra Pradesh (Tirupati, 2018). Today, the population has increased to 459, 985. Tirupati, known as the spiritual capital of Andhra, is the holiest Hindu Pilgrimage site, because of Tirumala Venkateshwara Temple as well as other temples (Tirupati, 2018).

History

Tirupati was an established town in the fifth century A.D. and was built and upgraded by various kingdoms. The temple has inscriptions written in Sanskrit, Telugu, Tamil, and Kannada. During the fifteenth century, Sri Tallapakka Annamacharya (a great composer), sung many songs in Telugu, praising the Town of Tirupati. Tirupati is said to be divine and includes rocks, streams, trees, and animals, and is said to be heaven on earth (Tirupati, 2018).

Lower Tirupati

Until 1500, people did not settle in Lower Tirupati. After 1130 C.E. (current era), the village grew around the Govindaraja Swamy Temple, which is now the heart of the city and a popular tourism place (Tirupati, 2018).

Flora and Fauna (Sri Venkateshwara National Park)

Tirupati holds the Sri Venkateshwara National Park. The park consists of fifteen-hundred vascular plant species. Some plants commonly found in Tirupati are the Red Sanders, Shorea Talura, Shorea Thumburggaia, Terminalia Pallida, Sandalwood, Suzygium Alternifolium, and Psilotum Nudum. The Cycus Beddomei is found in the Tirumala Hills. The Venkateshwara National Park is home to one-hundred seventy-eight species of birds. Some birds found in the park are the yellow-throated bulbul, grey-fronted green pegion, the oriental white-backed vulture, the large-hawk cuckoo, blue-faced malkoa, yellow-browned bulbul, Indian scimictar babbler, and the Loten's sunbird. The park is also a home to predators such as leopards and wild dogs, as well as the gliding lizard and golden gecko (Tirupati, 2018).

Tirupati Zoo

The Tirupati Zoo, known as the Sri Venkateswara Zoological Park is the second largest zoo in Asia, covering five-thousand five-hundred acres. The animals exhibited are those mentioned in Ramayana, Mahabharata, and Panchatantra. The Tirupati zoo, hosts several tigers, bears, elephants, peafowls, the Grey Pelican, the marshal crocodile, and the starred tortoise. Other animals in the Tirupati zoo are reptiles, deer, birds, monkey's, and lions (Tirupati, 2018).

Culture

Tirupati celebrates all Hindu festivals including Sankranti, Ugadi, Janmastami, Shivratri, Ganesh Chaturthi, Diwali, Ram Navami, and Karthik Poornima, among others. Annually, the carnival, Ganga Jatara is celebrated for one week in May honoring Goddess Gangamma. Rathasaptami, celebrated in February, is

when Venkateswara's Deity is taken in procession around the temple on seven different vahana's (animals used as vehicles) from morning to evening. Krishna Janmastami is also a major festival in Tirupati. The Lotus Temple is illuminated with lamps and paintings. Celebrations include prayers to Lord Krishna, Utlotsavam, Annamayya, Kirtana, alpana, and Geetha Parayanam (Tirupati, 2018).

The Gokulashtami Ashtanam (birth of Krishna) celebration takes place in Tirupati at the Tirumala Venkateswara Temple. Prayers are offered to cows, horses, and elephants. In Kapila Theertam, Shivratri and Karthik Poornima are the most auspicious occasions (Tirupati, 2018).

Tirupati is a sacred city in Andhra Pradesh, built in the fifth century. It is known for its beautiful parks, zoos, culture, and most importantly, the Tirupati Temple. Tirupati's large population is known for celebrating festivals in very grand ways (Tirupati, 2018).

Reference

Tirupati (2018). Retrieved from

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Tirupatioldid=848580588.

Retrieved July 2, 2018.

Assimilating into Multicultural America

Sankar Chanda

Assimilation is as old as Migration, and both are as old as the human race itself. The term Assimilation is often used synonymously with Integration and Adjustment. It is defined as the process of taking in and fully understanding the information and ideas pertaining to one's adoptive country, for the sake of blending in. The necessary condition for this is, of course, to have an open mind, free of preconceived opinions that are formed without reason or actual experience. In other words, one must rid the psyche of unquestioning beliefs that have once been drilled in as incontrovertibly true.

The phrase, "When in Rome, do as the Romans do", attributed to St. Ambrose, in Latin, "Si fueris Romae, Romano vivito more", exhorts the immigrant to respect the laws and customs of the host community. That certainly does not imply the negation of one's own heritage. America is the "Melting Pot" of different cultures orbiting the core American ideas, customs, and social behavior. Minorities may preserve their civilization, influence the indigenous one, and be influenced by it. The outward deportment of settlers eventually begins to resemble the demeanor and decorum of the host group.

Conforming to the local practices and perceptions when living abroad is a mark of respect and has many benefits. To start with, one needs to integrate with other frameworks and environments in order to expand the mind. Then again, it is a great way to make friends with people of native ethnicities. And, in any case, it helps to learn about the local history and way of life. Customs, traditions, and religious practices can all be assimilated between two or more cultures living in a nation state. Switzerland, China, and India are good examples of plurality.

Historically, Christianity assimilated many pagan customs and ceremonies in its mosaic. It adopted the polytheistic holy days such as Yule and the Spring Equinox, or Ostara, and claimed them as Christmas and Easter. It continued with the heathen custom of decorating fir trees at Christmas, and celebrated the symbols of fertility at Easter such as Easter eggs. Again, when Rome conquered Greece, Romans personalized the Greek gods. As examples, Zeus, the ruler of the gods, became Jupiter, Poseidon, god of the sea, was renamed Neptune, and Hades was redesignated as Pluto.

In America, one may recognize assimilation in speech as well. In the North East, there is a distinctive nasal accent. Within that wide group, a Boston accent differs from a Brooklyn accent, but both are identifiable in the larger North-Eastern accent. This happens when neighboring communities influence one another's way of speaking. Such linguistic assimilation is most noticeable in the use of popular slang. Proximate populations usually have varied slang words for the same things. During travel from one place to another, over time, it is common to pick up on and assimilate one's own language with the new slang or dialect.

Statistical assimilation refers to the data gathered over a period of time so as better understand the larger picture under study. Such assimilated information allows the researcher to better savvy how things work in the all-inclusive arena. A collected input may be assimilated into the model to become part of the mechanism by which all subsequent events are interpreted. This applies to the early immigrants into America, who have since become part of the benchmark or barometer of Americanness.

Cultural assimilation takes place when members of minority groups, including immigrants and indigenous clans, come to resemble those of the preeminent societal class. The change may be quick or gradual depending on the circumstances, readiness and elasticity of individuals. Full assimilation is marked by alikeness with the presiding category. Whether it is desirable for a given group to assimilate is often debated by members of both the minority and majority aggregations. After all, cultural assimilation does not guarantee social bonding.

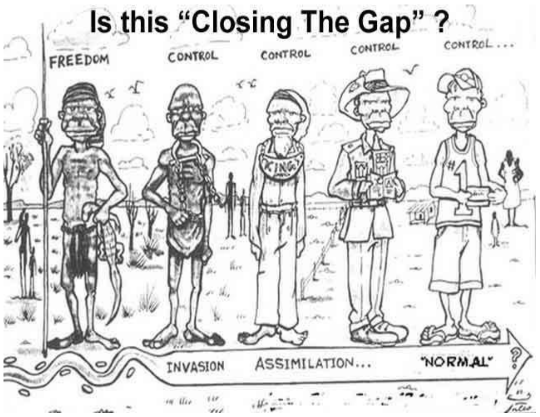

A person may voluntarily accept a different culture because of its political relevance or its perceived superiority. The Latin language and Roman culture have been over centuries internalized by people colonized by Ancient Rome.
However, cultural assimilation may be spontaneous or forced. A richer or stronger group can coercively absorb subjugated cultures.

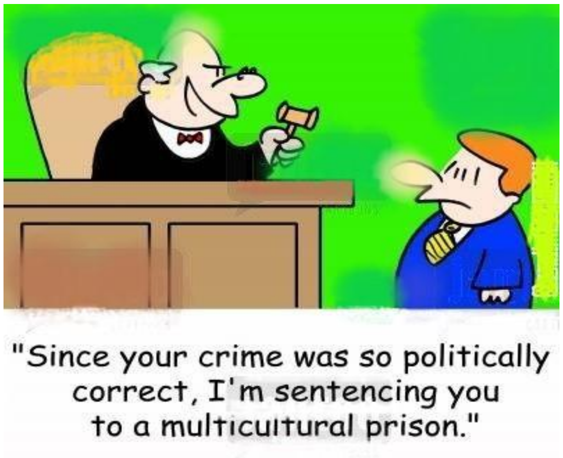

The term assimilation is nowadays mostly used with regard to settlers in a new land who try to gel with the natives through communication. But this is not a one-way street. There is an ongoing process of building an unified culture, through mutual contact and accommodation. The modern phenomenon is multiculturalism in a global context, that is not restricted to geographical borders. For instance, a shared language enables people to study and work internationally, without being constrained by cultural contours. People of different nationalities create unity in diversity in an universal experience with ingredients from different regions. Traditions from distinctive areas thus affect one another.

Many of our beliefs are not as absolute as we may think them to be. Is our mother the world's best chef? Does our culture comprise the tastiest cuisine? Is our way of greeting people the most gracious? We see people shaking hands, or bowing, or pecking cheeks, or bringing the palms together and bowing. It is expedient not to insist we are "right" and other cultures are wrong about these things.

"Diversity is a big thing here. We even have one guy who likes his job!"

Immigrant assimilation is largely determined by socio-economic standing, spatial distribution, second language attainment, and intermarriage. William A.V. Clark defines it as "a way of understanding the social dynamics of American society and that it is the process that occurs spontaneously and often unintended in the course of interaction between majority and minority groups." Acculturation is the process of social, psychological, and cultural change that stems from coalescing perceptions and practices.

The United States absorbed about 24 million aliens between 1880 and 1920. The early part of the 21st century witnessed large-scale migrations that impacted society and the immigrants themselves. Henry Pratt Fairchild relates American assimilation with Americanization. By sharing their experiences and histories, people fuse into the common cultural life.

"So we agree: having attained diversity, we must now categorise, coordinate, and consolidate it."

The status of immigrants in terms of class, racial, and ethnic characteristics is often not specifically defined, and expatriates may have more influence to demarcate their position. Importantly, institutional arrangements, such as legal aid bureaus and social organizations, may reduce racial segregation, and enhance assimilation, among émigrés and native-born people. Waters and Jimenez have speculated that these agencies may influence assimilation and the way researchers assess the process.

Assimilation can be a great learning experience. It helps us to empathize with the locals and to understand their way of viewing the world. We gain new and wise ideas, learn helpful habits, get a different perspective on life, and expand our horizons. By not isolating ourselves from the denizens we show that we are not so different from them after all. Needless to add, adherence to the laws is pragmatically important.

Politeness suggests participation in other people's customs. It may be by way of joining in a family meal, or other social activities. By valuing the local culture, we demonstrate and acknowledge that our background is not necessarily better than theirs. In some hot countries, locals have a midday nap to avoid getting caught in the sun. In some cold countries people dine early as it gets dark sooner. It is expedient to adapt the body to the climate.

Instinct tells us to avoid parts of town that locals do not speak well about, or to eat at the restaurants recommended by neighbors, or head out to popular haunts. Following the dwellers' lead is always advisable. They have lived there longer and can let us in on all of the important secrets.

One may conclude that there are many different ways of understanding life – and of living it too! Above all, there can be Oneness Without Sameness.

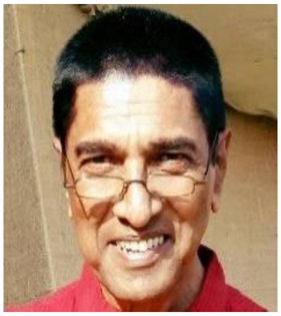

Sankar Chanda is a dreamer, learner and writer from Kolkata, India.

The Resurrection

Asish Mukherjee

The night was rather dark. Rain fell in a monotonous drizzle and gushed down the overflowing gutters as Ramesh came up the escalators of Tollygunge Metro station. Unwillingly, he stepped out on the uneven pavement and tried to find his step between the numerous muddy puddles.
"No hope of a taxi, I will have to walk" he thought angrily, while he turned up his coat collar and snapped open his umbrella. Not a star was visible in the sullen sky. The blue and white street lamps created eerie orbs of light in the smoggy air as though trying to pry into the nocturnal secrets of the rain-drenched city.
With a grunt, he made up his mind to start his mile-long walk down Southern Avenue.

"Why on earth did I get myself into this spot?" Ramesh wanted to kick himself.
"Why did I respond so quickly to a shadow from the past I want to forget? Will the past dog me till the end?" he muttered to himself.

Ramesh was still tired from jetlag. He had barely landed at the airport a few hours ago, left his luggage at a friend's place and hopped on the Metro. The beating rain wetting his face, and the muddy splash from passing cars were stark departures from his comfortable midwestern life in suburban Michigan. Nonetheless, unlike most people he was living the life of an exile pursued by a fearsome past. As he trudged along the familiar road, his thoughts drifted back to the many times he had walked this path in his easy youth. Despite his damp surroundings, he felt a strange warmth that only memories can bring.

Ramesh had got admitted to a premier college in Eastern India. He reveled in his achievement and excelled in academic performance. By the time he had finished his master's Degree, he was considered a top-notch student in Nuclear Physics. Life was good.

And then he saw the newspaper ad that would change his life!
If only he had known!
He looked up and wondered, "is there as unseen power that threads a new bead on the string of life every day, and we wait like faceless tin soldiers for our daily assignment?"
Ramesh stumbled over a pothole in the driving rain, and a lonely street dog started howling at the purple sky.
----- ----- -------

"Applications invited from students with exceptional academic background for internship at Saha Institute of Nuclear Research in a project of national importance" said the ad in a prestigious newspaper. Ramesh lost no time in applying and faced no difficulty in getting selected.
"Hi there" said man in his thirties, "I am Shantanu, just started as a technician. Glad to meet you."
Ramesh looked up at a good-looking tall man, with firm lines in his face that spoke of worldliness beyond his years, and a downward twist of a corner of his mouth that gave his smiles a rakish air.
"Hello, I am Ramesh, I am a physicist"
"Who has not heard of you in this institute?" said Shantanu. "I'll be honored to have you as a friend."
Shantanu was born in a rich family and lacked no luxuries as a child. In his early teens, his father - a successful investment banker, was convicted of insider trading and sentenced to a long prison term. Santanu's world fell apart, and he has ever since been watching the pleasures of life pass him by, pleasures he once had.

Ramesh had always been a loner and a scholar; the place of a friend was vacant in his heart so far. Shantanu filled this void quickly. He was always at his side to share both his happiness and his anxieties and lend a helping hand. And thus, began a rich friendship between the two young men.

Over the next one year, Ramesh worked hard and achieved spectacular results. One day he received a call from the director of the institute.

He knocked softly and opened the door of the director's office a crack.

"May I come in sir?" he said nervously, wondering what was in store.

"Sit down" said Mr. Das, waving at a plush chair.

"We are not only impressed by your academic ability, but your hard work too. We have decided to trust you with a top-secret project."

Mr. Das eyed Ramesh carefully for a few seconds, and then asked, "what is your concept of antimatter?".

This was easy for Ramesh. He answered promptly, "antimatter is a substance made of sub-atomic particles with charges and quantum properties opposite those of normal matter particles. When matter and antimatter are brought together both are annihilated in a tremendous explosion."

"Good, so you can guess that matter-antimatter reaction will be the most efficient energy source ever developed, and NASA is close to developing antimatter driven spacecraft"

"Our government had decided to explore the feasibility of converting our nuclear plants to antimatter powered ones. This will reduce the risk of nuclear fallout and offset the expense with higher energy yield for industry."

Ramesh listened mesmerized.

"You realize of course, that this project has serious military implications, and needs to be guarded as top secret".

Ramesh left the office with his head in the clouds. He did not notice Shantanu waiting for him till he felt a tap on his shoulder.

"What was that about? Is everything OK?"

"All is well. Das assigned me to a new project."

"Really? What about?"

"I will tell you later" said Ramesh. He saw Shantanu's face fall at this rebuttal.

"Darn, I have to maintain secrecy" thought Ramesh unhappily.

\----- ----- ----- -----

Suddenly a rich jewel dropped into the string of beads in Ramesh's life.

Ranita used to come to college in a shiny black Audi. She used to carry a Luis Vuitton bag and take her friends out to lunch in Park Street. Her clothes were made by boutique designers which were every girl's dream. She almost matched Byron's description "all that is best in" rich "and bright, meet in her aspect and her eyes." Ramesh looked upon her as a person from the other side.

Ranita was far beyond Ramesh's known world. She was the wave of an ocean that flooded his soul with pearly shells. But like an ocean she seemed unconquerable and remote. She used to hang out with a few select friends in the gardens, which did include Shantanu. The lush green fields of this famous institute started to attract Ramesh more than its dark laboratories.

Shantanu continued to remain his best friend. He was the first to stand by Ramesh's side on the terrible day his father expired, and the first to congratulate him with an expensive gift when he received an award from the institute. He had Ramesh's complete confidence and knew fully well how he worshiped Ranita. Interestingly, he kept cajoling Ramesh to advance the relationship further. Ramesh was hesitant, he was

happy to admire her from a distance. To him she was a Greek God come to earth, a gust of west wind in his monotonous life.
Goaded on by Shantanu, he finally decided to communicate his feelings to Ranita. It was a hard job, as he himself was not sure what exactly they were. He was an avid reader, so he delved into literature and came up with a poem that expressed his distant admiration. It was called “A Letter to Maria Gisborne” by Shelley. He sent this to her by email.
The response was disdainful.
“Poets like you are best described as overgrown kids” Ranita replied. “I will remind you that there are laws against workplace harassment, hope you will keep it in mind.”
Ramesh felt humiliated but took it in his stride. When he related this to Shantanu, he was surprised to see his reaction. The lines of his face break into vicious rage.
“Maybe that’s the sign of a true friend” thought Ramesh.
“I will fix that tart”, hissed Shantanu.
And then came the fateful day.
Ramesh came into the office early one morning, and found his computer broken into. Someone had hacked into it and presumably stolen all his work! His password was not working, and all his files were corrupt. The network was kept disconnected from Internet for security while sensitive experiments were on progress, so the job was certainly based on local collusion. The Institute blamed Ramesh as the prime suspect.
His happy days had had come to a grinding halt. He was dismissed in disgrace. The Ministry of External Affairs felt his to be a threat to national security and launched a CBI (Central Bureau of Investigation) inquiry.
----- ----- ----- -----
Ramesh stopped at a lone tea shop by the roadside. He held out a chit of paper with an address he had got on Facebook.
“Brother, can you tell me where this is?”
“Do you want some tea?” the shop-owner asked.
“No”
“People think I am an information center” The tired man grabbed the paper with his sweaty hands and regarded the address without interest.
“A mile straight down the road, you will see a bright sign saying South View Residency, it is a thirty storied building”
----- ----- ----- -----
Ramesh thanked the corrupt political leaders who could bypass law enforcement agencies. With the help of a MLA (Member of Legislative Assembly- a lawmaker), his travel documents to USA were approved. With his brilliant academic records, he was able to find a research assistant’s job at the University of Michigan. Now he had a small Toyota car, rented a single bedroom apartment and overall had a quiet daily life.
But every day felt like an exile. Every time he heard a knock on the door, he was afraid it might be the Interpol. He had no clue where his life was headed.
Three years had gone by. It seemed his life was on hold till one day he was surprised by a note that came through Facebook Messenger.
“Ranita wishes to meet you at South View Residencies, Apt 23 G, Kolkata ASAP.”
“Does proud Ranita wish to humiliate me further”, Ramesh thought with revulsion.
----- ----- ----- -----

Finally, the bright signage of the apartment building came into site. Ramesh entered the reception and remorsefully looked at the puddles his dripping umbrella was making on the floor.
“Brother, I need to see Ms. Ranita Sen in apartment 23 G”

The attendant regarded him from head to foot and was apparently satisfied with his Tommy Hilfiger shirt and Levis jeans, because he waved his hand to the nearest elevator without further questions.
A musical doorbell went off as Ramesh pressed the button, and the door was opened by a middle-aged governess.
“Ms. Sen is expecting me”
“Oh, it is rather late, do you have an appointment?”
“No, tell her Ramesh Chatterji is here.”
Ramesh regarded this lady more closely now. She seemed to be the ugliest specimen of the fair sex, that he has ever seen. The left side of her face was contorted with scars, and the corner of her mouth was drawn down giving it the appearance of a grimace.
“Please take a seat, I will bring you some tea.”
Ramesh sat on a comfortable couch and waited.
After twenty minutes, she returned.
“Madame has already gone to bed, please give her a few minutes.” She laid a cup of tea and some pastries on a coffee table.
“Sir, please let me have your jacket. It is dripping wet. Let me dry it for you, while you wait.”
Another half hour went by, Ramesh’s temper was rising.
The governess returned with his jacket dried and neatly ironed.
“I am very sorry Sir, but madame says she will not be able to see you tonight.”
Ramesh could not believe his ears, after all the hassles he has gone through to get here tonight!
“Did you tell her I came from USA just to see her?”
“I did Sir, but she said she is too sleepy, she did say you may try another day.”
“How very kind of her!” Ramesh almost hollered.
He left the apartment in a fit of rage and stamped down a couple of floors before he stopped for the elevator.
“Proud Ranita, haughty ad conceited as always. I should have known!”
Ramesh kicked a stone out of the way and walked rapidly down the street.
The rain had stopped, and taxis were out on the streets, slowing down for late passengers like birds swooping down on their preys.

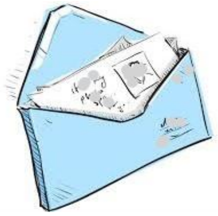

Ramesh put his hand in his jacket pocket to get his wallet and check whether he had cash for a cab fare. He felt an unfamiliar object. It was an envelope!
“The maid must have put it there by mistake when she was ironing”, Ramesh was aghast.
He sat down on a bench by the lonely shore of adjoining Dhakuria Lake and opened the envelope. There was a letter and a flash drive. Ramesh started reading in the faint glow of the streetlamp.
“I’m glad that you did not recognize me. I have been waiting all these three years to return a precious possession of yours. My face is the price I paid for it.
Shantanu was a spy planted by a foreign agency to gather your data. I was his paid agent. All the riches I displayed were ill gotten.
I had rebuffed you in those days, as I wanted to save you from his trap, but I did not succeed. I stole all your data but could not bring myself to give it to Shantanu. He threatened me with murder, and when I still did not comply, he threw acid on me.

I live every day of my life waiting for violent death. It means a lot to me that I have been able to return your research before I get run over by a truck. Please use the flash drive to clear your name and return to USA as an upright man.”
Bye, Ranita.

The drops falling from the overhead tree had blurred the ink, but Ramesh could still make out a few lines at the end of the letter, quoted from the poem he had once emailed.

'I (Memory) know the past alone-but summon home
My sister Hope, -she speaks of all to come.'
But I, an old diviner, know well
Every false verse of that sweet oracle" (P.B. Shelley)

Ramesh looked at the grey sky and whispered to himself "do the rules of God follow a different path than those devised by Man?"
The signage of the apartment shone bright.

Asish Mukherjee lives in Ohio, he is a surgeon by profession. Asish loves to read and write about travel.

Greater Binghamton Bengali Association: 2018

Committees	Participating Members
Finance	Utpal Roychowdhury, Dilip Hari, Pranab Datta, Samir Biswas.
Publicity	Utpal Roychowdhury, Pranab Datta, Dilip Hari, Samir Biswas, Ashim Datta, Parveen Paul, Aniruddha Banerjee, Manas Chatterji.
Puja Magazine	Pradipta Chatterji, Utpal Roychowdhury, Ashim Datta.
Puja Website	Utpal Roychowdhury.
Puja Ayojan	Amol Banerjee (Priest), Aniruddha Banerjee, Vaswati Biswas, Sheema Roychowdhury, Damayanti Ghosh, Dipa Dasgupta, Pradipta Chatterji, Anasua Datta, Abha Banerjee, Maitrayee Ganguly, Dipali Banerjee.
Prasad & Bhog	Anasua Datta, Vaswati Biswas, Damayanti Ghosh, Pradipta Chatterji, Sheema Roychowdhury, Parveen Paul.
Decoration	Vaswati Biswas, Parveen Paul, Pritam Das, Hiren & Dipali Banerjee, Dipa Dasgupta.
Lunch & Dinner	Dilip Hari, Subal Kumbhakar, Aniruddha Banerjee, Ashim Datta, Pritam Das, Abha Banerjee.
Pratima Transfer to ICC & Back	Samir Biswas, Aniruddha Banerjee, Pritam Das.
Local Artist Cultural Program	Utpal Roychowdhury.
Invited Artist Cultural Program	Dilip Hari.
Audio-visual Setup & Stage Management	John Kanazawich.
Hall Management	Samir Biswas, Dilip Hari, Ashim Datta, Sheema Roychowdhury, Maitrayee Ganguly.
Reception	Utpal Roychowdhury, Samir Biswas.
Cross Functional Coordination	Utpal Roychowdhury, Pranab Datta, Dilip Hari, Samir Biswas.
Patrons & Donors	Subimal & Sudipta Chatterjee, Manas & Pradipta Chatterji, Kanad & Indrani Ghosh, Subhash & Swapnila Das, Hiren & Dipali Banerjee, Sumit & Sudeshna Ray.

Greater Binghamton Bengali Association: 2018

Saturday, October 20, 2018

Durga Puja Programs

Morning Session:	
8:00 AM – 12:30 PM	Puja (Pushpanjali at 12:15 PM)
12:30 PM – 12.45 PM	Prasad
12:45 PM – 1:45 PM	Vegetarian Lunch
2:00 PM – 2:30 PM	Dashami Puja + Pushpanjali + Bisharjan
2:30 PM – 3:00 PM	Sindoor Utsab + Bijoya + Dhak

3:00 PM – 6:00 PM	Break (volunteers assemble in ICC at 5:45 PM)

Evening Session:	
6:00 PM – 6:30 PM	Sandhya Aarti
6:30 PM – 6:50 PM	Dhunuchi Dance
7:00 PM – 7:25 PM	Local Talents Showcase (Youngsters)
7:25 PM – 7:55 PM	Local Talents Showcase (Adults)
8:00 PM – 9:00 PM	Dinner
9:10 PM –11:40 PM	Invited Artist (Torsha Sarkar)

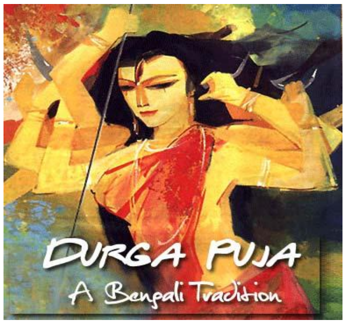

The Greater Binghamton Bengali Association (GBBA)

Takes great pleasure to announce

the Classical Sarod Recital by

Apratim Majumdar.

Venue: **India Cultural Centre**

1595 NYS RT 26, Vestal, NY 13850

Date: **November 10, 2018**

Time: 4:00 PM – 6:30 PM

Ticket: $10 per person

Sarod virtuoso Apratim Majumdar is a thinking musician and a creative Sarod Player - a composer of very special quality. He represents a remarkable combination of talent restraint and aplomb. Apratim's inspiring recital is marked by melodic fluidity, enthusiasm and expert craftsmanship.

Excerpt from 'Hindu'.

Greater Binghamton Bengali Association (GBBA)

October 20, 2018

Durga Puja Programs

Gbbapuja.webs.com

Pre-dinner Cultural Program

Youngsters - 7:00 PM - 7:25 PM

1. Amritakshi Sanyal: Recitation
2. Ananta Banerjee: Keyboard
3. Sureeta Das: Dance
4. Aditya Banerjee: Keyboard
5. Arpan Dasgupta: Keyboard

Adults - 7:30 PM - 7:55 PM

1. Smaraki Mohanty: Dance
2. Arnab Dasgupta: Tagore Song
3. Pradipta Chatterji: Discourse
4. Pooja Chitwadgi: Dance
5. Babla Bogam: Vocal

Post-dinner Cultural Program

Torsha Sarkar

Indian Idol - 2004

Second Runner up

Morning Session:

8:00 AM – 12:30 PM	Puja (Anjali at 12:15 PM)
12:30 PM – 12.45 PM	Prasad
1:00 PM – 2:00 PM	Vegetarian Lunch
2:00 PM – 2:30 PM	Dashami Puja + Pushpanjali + Bisharjan
2:30 PM – 3:00 PM	Sindoor Utsab + Bijoya + Dhak
3:00 PM – 6:00 PM	Break (volunteers meet in ICC at 5:45 PM)

Evening Session:

6:00 PM – 6:30 PM	Sandhya Aarti
6:30 PM – 6:50 PM	Dhunuchi Dance
7:00 PM – 7:25 PM	Local Talents Showcase – Youngsters
7:30 PM – 7:55 PM	Local Talent Showcase- Adults
8:00 PM – 9:00 PM	Dinner
9:10 PM –11:40 PM	Invited Artist (Torsha Sarkar)

Special Announcement

GBBA

Takes great pleasure to announce
Sarod Recital by

Apratim Majumdar.

Venue: India Cultural Centre
1595 NYS RT 26, Vestal, NY 13850
Date: November 10, 2018
Time: 4:00 PM - 6:30 PM
Ticket: $10 per person

Sarod virtuoso Apratim Majumdar is a creative Sarod Player - a composer of very special quality. Apratim's inspiring recital is marked by melodic fluidity, enthusiasm and expert craftsmanship.

Excerpt from 'Hindu'.

Puja Contributions:
$25 per person (Morning Session: Puja+ Lunch); **$30 per person** (Evening Session: Dinner+ Entertainment); **$45 per person** (Entire Program)
Patrons: $325/family, **Donors:** $100/family **$10** Full time student **$10** (12-18 Years) Free admission for children (12 years or less)

সৌরভ'১৮